রাসপূর্ণিমা ১৪১৮

শ্রীকৃষ্ণসংঘ বার্তা (৪৫/৪)

Srikrishna Sangha Barta (45/4)

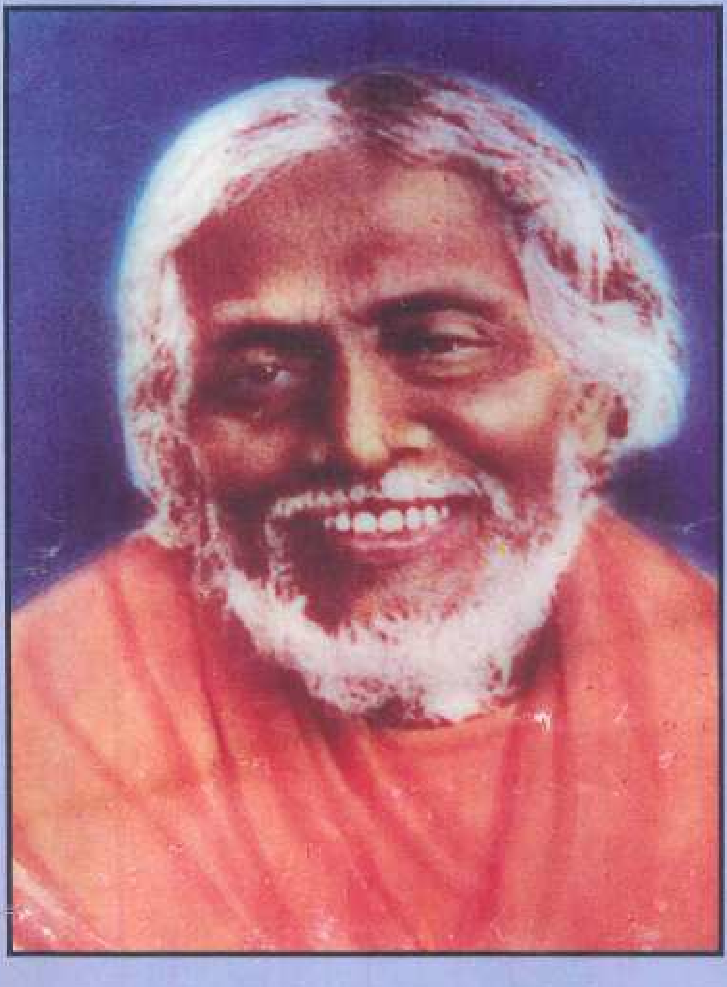

শ্রীশ্রীমৎ প্রেমানন্দ তীর্থস্বামীজীর ১৪০তম আর্বিভাব রাসপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত

নিবেদনে ঃ শ্রীকৃষ্ণ সংঘ
'আনন্দধাম আবাসন' ১/১এ, খানপুর রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৪৭, ফোন:২৪১১-৫৩৭৮

May the divine Message of

Sri Srimat Premananda Tirthaswamiji

Sublimely Preached by

Srimat Sadananda Brahmachariji

Spread throughout this world

an humble devotee

শ্রীকৃষ্ণ সংঘ বার্তা

Srikrishna Sangha Barta

পঞ্চচত্বারিংশৎবর্ষ চতুর্থ খণ্ড	শ্রীশ্রীমৎ প্রেমানন্দ তীর্থস্বামীজী মহারাজের ১৪০তম আবির্ভাব তিথি	রাসপূর্ণিমা ১৪১৮ ১০ই নভেম্বর ২০১১

সূচীপত্র

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
অমৃত কল্যাণ বাণী:	শ্রীমৎ প্রেমানন্দ তীর্থস্বামী	১
মন্ত্রোচ্চারণ :	ঐ	৩
সাধনার মূলসূত্র:	ঐ	৫
ভিতর বাহিরের সামঞ্জস্য:	ঐ	৬
অপ্রকাশিত পত্রাবলী:	ঐ	৯
তৎকথনং তচ্চিন্তনং..:	ঐ	১১
পত্রপুটে জীবনবাণী:	শ্রীমৎ সদানন্দ ব্রহ্মচারী	১৪
কবিতা:	শ্রী অভয়	১৬
বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্:	Upendra Nath Dutta Omkarnath Muttoo	১৭
সন্ন্যাসীদাদাকে ...:	সুবিমল রায়	২২
রাসপূর্ণিমা:	মনোজেন্দু মজুদার	২৫
সচিবের নিবেদন:		২৭
সম্পাদকীয়:		২৮
Amrita-Kalyan-Bani:	Srimat Premananda Tirthaswami	29
Yajna-Tattwa:	Srimat Premananda Tirthaswami	30

অমৃত কল্যান বাণী

, মানুষ ভগবানকে নিয়া তাঁহার পূজাজ্ঞানে সংসার করিতে শিখে নাই তাই কষ্ট পায়। অনাসক্ত অনুরাগী সংসারী সংসারত্যাগী ছিল তাঁদের আদর্শ। ভগবান মঙ্গলময়। তাঁহার উপর বিশ্বাস ঠিক রাখিও। তিনি নিজ গুণে তাঁহার মনের মতন করিয়া লইবেন।

, লোকেরা সাধন সাধন করে পাগল হয় — একটা মন্ত্র জপ কিংবা খুব আসন প্রাণায়ামের মধ্যেই শুধু নিহিত হয়। প্রাত্যহিক জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে যে স্মরণ মনন ও ভক্তি নিষ্ঠার প্রকাশ হয়, তাহাই আমার মতে মস্ত বড় সাধনা। তারপর ধীরে ধীরে কর্ম্মক্ষয়ে ভগবান এমন বিধান ও ব্যবস্থা করেন যাহাতে আধ্যাত্মিক শক্তিলাভ ততটা সুদুর্লভ হয় না। প্রাত্যহিক জীবনে ঠিক থাকাই মস্ত সাধনা। 'দুখের দিনে নিখিল বিশ্ব যখন করে বঞ্চনা, তোমারে যেন না করি সংশয়।' আমার ভগবৎ বিশ্বাস ও ভগবৎকৃপা আমায় শান্তিতে রাখে। বিশ্বাস করিয়া দেখিয়াছি তাঁর ইচ্ছা মঙ্গলময় আর তাহাতে কেবল বাধা দিতে পারে না।

, মা দাঁড়াইয়া আছেন — শিবের বুকের উপরে। শিব ছাড়া — জগতের কল্যাণ ছাড়া — মায়ের আর কোন উদ্দেশ্য

e-mail ID:
srikrishnasangha@ymail.com
website:
http//:www.srikrishna-sangha.org

নাই। মা — শিব ছাড়া — কল্যাণ ছাড়া থাকিতে পারেন না। মাকে পাইবার একমাত্র রাস্তা জীবের সেবা করা।

, কর্ম্মফলের উপর মানুষের হাত নেই তাই ভক্ত বিপদে আপদে ভগবানের দিকে চাহিয়া অবিচলিত থাকে, নিজের শক্তিতে দাঁড়াইতে হইলে অনেক অসুবিধা মনে হয়, তাঁর শক্তিতে কিছু করা কিছুই কঠিন নহে। সংসারটা সংসারই, এখানে জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে ভাঁটা থাকে, সুখ দুঃখ মিলিয়ে খেলায় বিচলিত হইতে গেলে চলে না। সব দেখে যেতে হয় — মানুষের হাত কম।

, বিশ্বাস করিয়াছি ভগবান আছেন, তাঁকে পাওয়া যায় তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়। একুল ওকুল দুকুলও বজায় রাখিব তাঁহাকেও পাইব তা হয় না। সব ছেড়ে তাঁকে চাইতে হবে — তারপরে তাঁকে পেয়ে সব আবার আর এক ভাবে আপনার হইবে। তখন বাস করা যাইবে অনাসক্ত অনুরাগী সংসারী সংসারত্যাগী ভাবে।

, ভগবানের জন্য যখন প্রাণ কাঁদে তখন যে এক এক নিমেষকেই এক এক যুগ বলিয়া মনে হয় তাই তোমার প্রাণের ভাবের মতে বুঝতে পারবে তাঁকে ক'জন্ম পরে পাবে তবে এটা ঠিক জেনো প্রাণ হইতে তাঁকে চাইলে আর একটুও বিলম্ব করিতে পারেন না 'প্রাণ কাঁদে' ঐ কান্নায় আবার রকমারী আছে, সুখের কান্নার কাজ, কাজ নয় — প্রাণের কান্না চাই। তবে তিনি কি আমাদের কাঁদাতে ভালবাসেন ? তা নয়। তাঁর কাছে যে যা চায় তা পায়। সব পাওয়ার ভিতরে তাঁকে চাইলে পাওয়া যায় না। সকল কর্ম্মই করবে কর্ত্তব্য বলে অজ্ঞানের মত, মন প্রাণ চাইবে কেবল তাঁকে।

, প্রেমানন্দ বোকা খামখেয়ালী হইলেও হৃদয়হীন নহে। তোমাদেরে কতটা ভালবাসে তোমাদের সুখে কতটা সুখী হয় বুঝিতে চেষ্টা করিও। সে যতখানি কষ্ট দেয়, শুদ্ধ অন্ততঃ ততখানি সুখের ব্যবস্থা না করিয়া থাকিতে পারে না, আশাকরি হতাশ হইবে না ; ভগবান তোমাদের সুসময়ের ব্যবস্থা করিবেন।

(প্রেমানন্দ কথা থেকে)

মন্ত্রোচ্চারণ

শ্রীমৎ প্রেমানন্দ তীর্থস্বামী

আমাদের সন্ধ্যার সমস্ত মন্ত্রগুলি সংস্কৃতভাষায় লিখিত বলিয়া নানারূপ কথা শুনিতে পাওয়া যায়। আমাদের জীবনের মূল্যবান সময়টা যে একটা বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিতে যাইবে, মাতৃভাষা, সংস্কৃত আর্য্যভাষা যে এইভাবে অনাদৃত দুর্বোধ্য হাস্যাস্পদ হইয়া পড়িবে তাহা আমরা কেন, ঋষিরাও বোধহয় ততটা ভাবিবার সুযোগ পান নাই। যাহারা মন্ত্রগুলিকে ভাষান্তরে অনুবাদিত করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত তাহাদের একটু ভাবিয়া দেখা উচিত যে সংস্কৃত ভাষা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বের উপরে স্থাপিত। ইহার ছন্দতত্ত্ব সাধক ব্যতীত অন্যের দুর্বোধ্য। মন্ত্রগুলি এমন ভাবে সাজানো রহিয়াছে ঠিকভাবে উচ্চারিত হইলে তাহার ভাবগুলি আপনা হইতে প্রকাশ পাইতে চেষ্টা করে। মনে রাখিতে হইবে, মহর্ষি পাণিনীদেব সংস্কৃত ব্যাকরণের কর্ত্তা, স্বয়ং পতঞ্জলিদেব তাহার ভাষ্য লিখিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। ভাষান্তরে অনুবাদ করিলে যে মন্ত্রের শক্তি হ্রাস হয় তাহাতে আমাদের সন্দেহ নয়।

শ্রীভগবান আপন মায়ার সাহায্যে অনন্তরূপে প্রতীয়মান হইতে বসিয়াছেন। অনন্তদেবের সবই যে অনন্ত। তাই তাঁহার জগজ্জীবতত্ত্বের ভিতরেও আমরা অনন্ত ভাবের ভেদ দেখিতে পাই। অনন্ত অধিকারীর জন্য অনন্তভাবের সাধনপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তবে সেই সমস্ত অধিকারীর সাধারণ উদ্দেশ্য যেমন পূর্ণতা লাভ, ভগবৎ প্রাপ্তি, তেমনি সেই ভগবৎ প্রাপ্তির সাধারণ মন্ত্রও ওঁকার বলিয়া বর্ণিত।

সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বিশেষ অধিকারীর পক্ষে বিশেষ ব্যবস্থা, বিশেষ পন্থা, বিশেষ বিশেষ মন্ত্র নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সেই বিশেষভাবে সাধনার মূলটি আমরা সমস্ত মন্ত্রের বীজের মধ্যে নিহিত দেখিতে পাই।

ইহার পরে দেবতাতত্ত্বের ভিতর দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে সেই বিষয়ের সাধনপ্রণালী। এইগুলি হইল সাধারণ ব্যবস্থা। যেখানে মন্ত্রটি এক অক্ষরের সেখানে তাহার মধ্যে এই তিনটি তত্ত্বই লুক্কায়িত দেখিতে পাই।

ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর জন্য সাধন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কোন্ মন্ত্র কাহার পক্ষে প্রশস্ত তাহা নির্ণয় করিবার জন্য আদর্শ গুরুর ভেদে, মন্ত্রভেদ প্রয়োজন। ডাক্তারখানায় সব ঔষধ থাকিলেও কাহার পক্ষে কোন ঔষধ কল্যাণপ্রদ তাহা ঠিক করিবার জন্য উপযুক্ত ডাক্তারের আবশ্যক হয়। গুরুবিভ্রাটের ফলে সাধনবিভ্রাট ঘটিয়া মন্ত্রসাধনা সাধারণের নিকট নিস্ফল বলিয়া পরিগণিত হইতে বসিয়াছে। শিষ্যের স্থূল সূক্ষ্ম কারণতত্ত্ব বিশেষভাবে সন্দর্শন করিয়া, প্রাচীনকালে ঠিক করা হইত কাহার পক্ষে কোন মন্ত্র হিতকারী, কাহার জীবনে কোন রাস্তা দিয়া, কোন জাতীয় সাধন প্রণালী অবলম্বনে পূর্ণতা লাভ, ভগবৎ প্রাপ্তি স্বাভাবিক হইয়া পড়িবে। মন্ত্র শুনিয়া বলা যাইত কাহার জীবনের কি উদ্দেশ্য, কে কোন পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে।

জীবনের সমস্ত কর্ত্তব্যগুলি, জীবনের যাবতীয় সাধনপ্রণালী, সাধনরাজ্যের যাবতীয় তত্ত্বগুলি এক একটি মন্ত্রের মধ্যে বীজাকারে সূত্রভাবে অবস্থিত থাকে। ভগবৎকৃপায় সৌভাগ্যবশতঃ সেই মন্ত্রটি

সদ্‌গুরুর নিকট লাভ করিয়া, তাহা শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা, সাধক সংসার সাগর হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ হয়। যাহার মননে ত্রাণ পাওয়া যায় তাহাই মন্ত্র। 'মননাৎ ত্রায়তে যস্মাৎ তস্মান্মন্ত্রঃ উদাহৃতঃ।' শব্দের শক্তি অস্বীকার করিবার যো নাই। কটুবাক্য শুনিলে ক্রোধ এবং মিষ্টবাক্য শুনিলে যে প্রেম জন্মে তাহা সাধারণ জীবের পক্ষে অস্বীকার করা কঠিন।

অনেক বিচার করিয়া শাস্ত্রকারগণ নাম ও নামীকে অভেদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। উচ্চারণটা ঠিক হইলে নাম যে নামীর কাছে গিয়া পৌঁছায় তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। শব্দব্রহ্মতত্ত্বে দেখানো হইয়াছে প্রত্যেক তত্ত্ব কি-ভাবে ব্রহ্ম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরী অবস্থা ভেদ করিয়া, আমাদের কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া, সমস্ত তত্ত্বগুলি ভেদ করিয়া আত্মা পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। শ্রীকৃষ্ণজীবনে সব তত্ত্বগুলি পূর্ণ বিকশিত থাকার ফলে তাহার বংশীধ্বনি, মধুর আহ্বান শ্রীরাধাকে এমন ভাবে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। সাধক ও অসাধকের আহ্বানের ভিতরে একটা পার্থক্যভাব সাধারণেও অনুভব করিবার সুযোগ পায়।

মন্ত্রজপ অর্থই মন্ত্রের ভাবনা। 'তজ্জপস্তদর্থভাবনম্'। মন্ত্রতত্ত্বটি ধ্যান করিতে হইবে, যাহার ফলে আমাদের ভিতরকার সব তত্ত্বগুলি তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া পড়িবে। কবিরাজের ওষুধের ভাবনার কথা মনে কর। 'ভাবিতং বনং চন্দনেন' কথাটা স্মরণ কর। চন্দনবনের সব গাছগুলিতে চন্দনের গন্ধ পাওয়া যায়। ধ্যানযোগসিদ্ধ মহাত্মাদের নিকট বসিলে ভগবানের গন্ধ টের পাওয়া যায়।

মন্ত্রের অর্থ ও চৈতন্যতত্ত্ব না জানিলে মন্ত্রযোগে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। 'মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যো ন জানাতি সাধকঃ। সপ্তলক্ষপ্রজপ্তাপি তস্য মন্ত্রং ন সিদ্ধতি।।' যে সাধক ভগবানকে ভগবৎ বিধানকে জীবনের সমস্ত ঘটনাগুলিকে পরম মঙ্গলের নিদান ভাবে গ্রহণ করিতে পারে না তাহার ভিতর দিয়া নাকি শিবমন্ত্র ঠিক ভাবে উচ্চারিত হওয়া সম্ভবপর নহে। ইহার পরে মন্ত্রচৈতন্য মন্ত্রের অনুকূল যৌগিক ক্রিয়া সাপেক্ষ।

সাধকগণ, ঋষিগণ বলেন, কোনও কাজে সিদ্ধিলাভের জন্য যন্ত্র তন্ত্র ও মন্ত্রের সাধনা আবশ্যক। দূরদর্শনের জন্য যেমন দূরবীক্ষণ যন্ত্র তাহার কেন্দ্রীকরণ ও তন্ত্র, তাহাতে চিত্ত সমাবেশ রূপ মননাত্মক মন্ত্র আবশ্যক — তেমনি সাধনরাজ্যে কোন তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিলে তৎসম্বন্ধীয় যন্ত্র তাহাতে শক্তিসঞ্চার প্রণালীরূপ তন্ত্র এবং সেই সাধনে মনস্থির রূপ মন্ত্র একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। প্রত্যেক বৈদিক মন্ত্রের সঙ্গে ঋষি ছন্দ দেবতা ও বিনিয়োগ তত্ত্বের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রণালীতে সাধন অনুষ্ঠিত হইলে সিদ্ধিলাভ যে আপনা হইতে উপস্থিত হয়।

যাঁহারা শব্দকে শুধু একটা বাহিরের তামসিক উচ্চারণে, বৈখরী অবস্থায় পর্য্যবসিত করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা মন্ত্ররহস্য হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন, প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। শব্দের পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরী অবস্থার সাহায্যে মন্ত্ররহস্য জ্ঞাত হইতে হইবে। তারপর হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুত তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ছন্দানুবর্ত্তীভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিলে তখন আমাদের ভিতরকার অনেকগুলি যন্ত্র যে মন্ত্রানুভূতির অনুকূলভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া অভিলষিত ভাব প্রকাশের, তত্ত্বানুভূতির সহায় হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কণ্ঠ্য তালব্য অনুনাসিক আদি নাম ভেদগুলি এই তত্ত্বোপলব্ধির সহায়। মন্ত্র উচ্চারণটা ঠিকভাবে হইলে

তাহাতে সাধকের প্রাণের কপাট, মনের কপাট খুলিয়া যাওয়া, গ্রন্থিভেদ হওয়াই যে স্বাভাবিক হইয়া পড়ে।

তাহার পরে ভাগবতাদি গ্রন্থেও দেখিতে পাই হেলায় অশ্রদ্ধায় (হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা) ভগবৎ নাম উচ্চারণের ফল নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। চৈতন্যদেব বলিতেন, নামই কলির জীবের উদ্ধারের উপায়, নাম বিনা জীবের আর গতি নাই। 'নামে কত সুধা কত মধু কতই আরাম রে। আছে যার নামে ভক্তি সে জানে নামের শক্তি। ভক্তি ক'রে নিলে নাম, না ক'রে কারে বাম রে।।' ইত্যাদি গানগুলিও মন্ত্রশক্তির মহিমা প্রকাশ করে। অজামিল মৃত্যুকালে প্রতীক ভাবে নারায়ণের নাম উচ্চারণ করিয়া যে ক্রমমুক্তির সোপানে পৌঁছিয়াছিল তাহার মধ্যেও অনেকখানি সাধনতত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। আসল কথা, মন্ত্রশক্তির মহিমা অস্বীকার করা যায় না। বিনা বিচারে মন্ত্রতত্ত্বকে অগ্রাহ্য করিতে গিয়া আমরা যে পদে পদে বঞ্চিত হই, তাহাতে সন্দেহ নাই। সন্ধ্যার মন্ত্রগুলি দেখিয়া বুদ্ধির দোষে ভয় না পাইয়া, যদি তাহার সাহায্যে অনুষ্ঠানগুলির ভিতর দিয়া চলিতে থাকি তাহা হইলে সন্ধ্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য যে সফল হইবে তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই।

('সাধনা ও মুক্তি' বই থেকে)

সাধনার মূলসূত্র

শ্রীমৎ প্রেমানন্দ তীর্থস্বামী

(ক) সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম
আনন্দরূমমৃতং যদ্ বিভাতি।

ভগবান সত্যস্বরূপ সুতরাং কোনরূপ মিথ্যা লইয়া থাকিলে বা মিথ্যার প্রশ্রয় দিলে সত্যস্বরূপকে পাওয়া অসম্ভব হইবে।

ভগবান জ্ঞানস্বরূপ সুতরাং সজ্ঞানে কোনওরূপ বিচারে ভুল করিলে বা কাহাকেও ভুল বুঝাইলে জ্ঞানস্বরূপ ভগবান হইতে দূরে থাকিতে হইবে।

ভগবান আনন্দস্বরূপ সুতরাং নিজে আনন্দে না থাকিলে বা অপরকে আনন্দ দিতে চেষ্টা না করিলে আনন্দময়কে অনুভব করিবার সুযোগ জুটিবে না।

(খ) শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্।

তিনি শান্তম্ — তাঁহার ভিতর কোনওরূপ চঞ্চলতা নাই। তাই তাঁহাকে পাইতে হইলে আমাদিগকেও সুশান্ত সর্ব্বেন্দ্রিয় বৃত্তিমন্তঃ হইতে হইবে। তিনি সাধক ছাড়া অন্যের অনুভববেদ্য নহেন।

তিনি শিবম্ — তিনি জগৎজীবের কল্যাণসাধনে তৎপর নিঃস্বার্থভাবে জগৎজীবের সেবায় রত না থাকিলে কেহ তাঁহার স্বরূপ

বুঝিতে সমর্থ হয় না।

তিনি অদ্বৈতম্ — সর্ব্বদা অখণ্ড অদ্বৈত ভাবে যাহারা সমস্ত দ্বৈতভাব বর্জ্জন করিয়া সর্ব্বত্র একত্রভাবের উপলব্ধিতে, একত্ব প্রচারে ব্রতী, তাহারাই শুধু অখণ্ড স্বরূপের উপলব্ধি করিতে পারে। শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্ বাক্যের মধ্যে সাধনরাজ্যের গূণ তত্ত্ব নিহিত।

সাধনরাজ্যে প্রথম কাজ — সংযত হওয়া।
দ্বিতীয় কাজ — জীবসেবা
তৃতীয় কাজ — অদ্বৈততত্ত্ব আস্বাদ করা।

ভিতর বাহিরের সামঞ্জস্য

শ্রীমৎ প্রেমানন্দ তীর্থস্বামী

ভিতরের ভাবে বাহিরের সমস্ত দেহটাই সংক্রামিত হইয়া পড়ে। ইহার কারণ ভিতরটা চায় বাহিরে আসিয়া প্রকাশ পাইতে, বাহিরটা চায় তাহার সব খবরগুলি ভিতরে অন্দরমহলে, এমন কি মহারাজচক্রবর্ত্তীর নিকট, পরমাত্মার নিকট পৌঁছাইয়া দেয়। ভিতর বাহিরের সামঞ্জস্যটাই আদর্শ জীবনের উদ্দেশ্য, যদিও আদর্শ-পুরুষ ভিতর বাহিরের সামঞ্জস্য এবং অসামঞ্জস্যের মধ্য দিয়া ভগবানের লীলা-তত্ত্ব আস্বাদ করিবার সুযোগ পান। রামায়ণের জন্য রামের যতটা দরকার, রাবণেরও যে ঠিক ততটাই দরকার তাহা তাঁহারা ভুলিয়া যান না। এই রাম-রাবণের, দেবাসুরের সংগ্রামের মধ্য দিয়া তাঁহারা ভগবৎ লীলা-বিভূতি সন্দর্শন করেন। ইহাদের কাহারও কার্য্যেই তাঁহারা বিচলিত হন না। কারণ তাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বের কাছে গিয়া প্রকৃত তত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করিয়া জানিয়া লইয়াছেন যে রামও রাম নহে রাবণও রাবণ নহে। ইহাদের উভয়েরই আবির্ভাব, প্রকাশ, কার্য্যকলাপ ভগবৎ লীলা-রহস্য প্রচারের সহায়।

আদর্শ জীবন লাভ না হইলে, প্রকৃত সাত্ত্বিকভাবে স্থিত হইতে না পারিলে স্বরূপ প্রতিষ্ঠ হইয়া, স্বরূপপ্রতিষ্ঠ থাকিয়া লীলারস আস্বাদ করিতে পারা যায় না বলিয়াই বলা হইয়াছে, 'রামাদিবৎ প্রবর্ত্তিতব্যং ন তু রাবণাদিবৎ', তোমরা রামের ন্যায় হইতে চেষ্টা কর রাবণের মত হইতে চেষ্টা করিও না। ইহার পরেও অসুর-জন্মের ভিতর দিয়া মধ্যে ভগবৎ প্রাপ্তি হয় এবং দেবতা-জন্মের মধ্য দিয়া সাত জন্মে ভগবৎ প্রাপ্ত হয়, — এই ভাবের ভিতর দিয়া রাবণ হওয়াটা যে কত কঠিন তাহারও একটা আভাস দেওয়া হইয়াছে। পরিণামে যে দেবাসুরের একই গতি লাভ হয় তাহারও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানশাস্ত্র বলেন উত্তরের শেষ সীমায় ও দক্ষিণের শেষ সীমায়, উপরের শেষ সীমায় ও নীচের শেষ সীমায় নাকি খুব কম পার্থক্য থাকে। শূন্য হইতে যাহা আবির্ভূত তাহাকে আবার শূন্যে পরিণত হইবার সুযোগ না দিলে চলিবে কেন? ঋণ ও ধন (negative and positive) — এর উৎপত্তি কার্য্যকলাপ

এবং তত্ত্ব ইহার সাক্ষী।

দেবতাতত্ত্ব ও অসুরতত্ত্বের সমান আবশ্যক হইলেও আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে দেবতা-তত্ত্বের ভিতর দিয়া। দেবতাতত্ত্বে ভিতর বাহিরের সামঞ্জস্য বেশ সুন্দরভাবে দেখানো হইয়াছে। ভিতরটা কি ভাবে বাহিরে আসিতে, বাহিরটা কি ভাবে ভিতরে যাইতে, স্বাভাবিকভাবে যাইতে চেষ্টা করে তাহাই ছিল তোমার প্রশ্ন। সুতরাং আগন্তুক আবশ্যকীয় দেবাসুর-তত্ত্ব সম্বন্ধে বেশী কথা না বলিয়া শুধু তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয়টাকে সহজ করিতে চেষ্টা করা যাউক। ভিতরের ভাবে বাহিরটা পর্য্যন্ত কি ভাবে পরিভাবিত হইয়া যায় মনস্তত্ত্ববিদ্ তাহা বিশেষভাবে দেখাইতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। ভিতরে একটা প্রেমের ভাব আসিলে বাহ্যিক দেহ পর্য্যন্ত যে কি ভাবে প্রেমে বিভাবিত হইয়া প্রেমময় রূপ ধারণ করে তাহাই আমাদের অচোনার বিষয় ছিল। মনুষ্যাদি উচ্চস্তরের জীবে এ ভাব সহজেই উপলক্ষিত হয় বলিয়া আমরা তাহার উল্লেখ না করিয়া নিম্নশ্রেণীর জীবে প্রেমের এইরূপ বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিব। প্রেমের আহ্বানে হিংস্র জন্তু পর্য্যন্ত কি ভাবে অভিভূত হইয়া পরস্পর হিংসাভাব ভুলিয়া একত্রে বাস করে, ঋষিদের আশ্রমে সিংহ ব্যাঘ্রাদি ও হরিণ প্রভৃতি জন্তুর একত্র অবস্থান, একত্র স্বচ্ছন্দে বিহার তাহার সাক্ষী। একটা প্রেমের ভাবের সঞ্চারে কুকুর বিড়াল ব্যাঘ্রাদির কঠোর নখগুলি যে কি ভাবে ভিতরের দিকে সঙ্কুচিত হইয়া যায় তাহা অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। শাবকগুলিকে আদর করিবার সময়, প্রভুর সঙ্গে খেলা করিবার সময় এ ভাবটা খুব সুন্দরভাবে উপলব্ধি করা যায়। ক্রোধের সময় ঐ সব নখগুলি কি ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বীর দেহ বিদারণের অনুরূপ হইয়া উঠে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভিতরের প্রেমের ভাবের পরিণামে শরীরের সমস্ত তত্ত্বগুলি প্রেমামৃতে পরিপূরিত হইয়া প্রেম বিকাশের অনুকূল হইয়া পড়ে। ভিতরে ক্রোধ হিংসার ভাব আসিলে সমস্ত তত্ত্বগুলিই আবার ক্রোধ-বিষে জর্জ্জরীভূত হইয়া পড়ে। খেলা করিবার সময় কুকুর বিড়াল হইতে আমরা যে আঘাত প্রাপ্ত হই তাহা তত ভয়ের কারণ মনে হয় না। রাগ করিয়া ঐ সব জন্তু যখন আমাদিগকে কামড়ায় তখন তাহার দন্ত ও নখে বিষের কল্পনা করিয়া আমরা ভীত হইয়া পড়ি। উন্মত্ত অবস্থায় কামড়াইলে আমাদের যে কি দুরবস্থা হয় তাহা বোধহয় সকলেই জানেন। শুনিতে পাওয়া যায় রুশ দেশের কোনও রমণী তাহার কোন শত্রুর সহিত ভীষণভাবে ঝগড়া বিবাদ করিয়া বাড়ি গিয়া তাহার শিশুটিকে স্তন্যদুগ্ধ পান করাইলে শিশুটি সেই মাতৃস্তনে বিষ সংক্রমণের ফলে প্রাণত্যাগ করে। অতিরিক্তভাবে ক্রোধের সঞ্চার হইলে যে আমাদের সমস্ত দেহ ক্রোধরূপ বিষে জর্জ্জরিত হইয়া পড়ে তাহা আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। এইজন্য ঋষিগণ সাধকদিগকে সব সময় যথাসম্ভব সাত্ত্বিকভাবে অবস্থিত থাকিতে সচেষ্ট হইতে বলিয়াছেন। গীতার 'যো যত্-শ্রদ্ধ স এব সঃ' এই কথাটির মধ্যে এই তত্ত্ব নিহিত দেখিতে পাই। সাধকগণ ভাবনাময় যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা ভিতরকার সমস্ত তত্ত্বগুলিকে ভগবৎভাবে ভাবিত করিয়া তুলিতেন।

কারণে যাহা আছে তাহাই কার্য্যে প্রকাশ পাওয়া স্বাভাবিক। 'কারণ-গুণাঃ কার্য্যগুণমারভন্তে।' প্রকৃত সাধুর বাহ্যিক আচার ব্যবহারে এজন্য একটা সাত্ত্বিকভাবের বিকাশ দেখিতে আশা করিয়া থাকি। যাহারা বলেন বাহ্যিক আচার ব্যবহার বেশভূষা কথাবার্ত্তার সঙ্গে ভিতরের ভাবের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই, তাহাদের মতটা আমরা এত সহজে

বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কুম্ভকারের চক্র ঘূর্ণন ব্যাপারে ঘরটি তৈয়ার হইয়া গেলেও যখন দণ্ডটি উঠাইয়া নেওয়া হয়, তখনও চক্রটি সেইদিকেই ঘুরিতে থাকে, বিপরীত দিকে ঘোরা অস্বাভাবিক। সিদ্ধাবস্থা সাধন অবস্থারই পরিণতি, সুতরাং সিদ্ধাবস্থায় আমরা কোনওরূপ তামসিক কথা ভাব ও কাজের বিকাশ দেখিতে আশা করি না। ভাগবতে যে সিদ্ধ মহাত্মাদের 'বালোন্মত্ত-পিশাচবৎ' অবস্থানের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, সেখানেও আমরা এই মতের ব্যাভিচার দেখিতে পাই না। সিদ্ধাবস্থায় মানুষ যে সাধারণ মনুষ্যের একটা কল্পিত সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে অভ্যস্ত হন না, এই ভাবটাকেই সেখানে একটু বেশী জোর দিয়া বলা হইয়াছে। যে সংসারের অভিধানে সরলতা মূর্খতার পরিচায়ক, পরহিত স্বহিতের সম্পূর্ণ বিপরীত, ভিতরের সমস্ত কলুষিত মতগুলি, ভাবগুলি, কাজগুলি একটা সভ্যতার আবরণ দিয়া ঢাকিতে পারিলেই যথেষ্ট হইয়া গেল, যে সংসারে সরল সাধু সজ্জনদিগকে সংসার ছাড়িয়া বনে গিয়া বাস করিতে হয়, শয়তান ধার্ম্মিকের পোষাক পরিয়া ধর্ম্মের প্রচারক সাজিয়া, ধর্ম্মের নামে যাবতীয় অধর্ম্মের তাণ্ডব লীলা প্রদর্শন করিয়া সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ পায়, সেই সংসারের দৃষ্টিতে সিদ্ধ মহাত্মাগণ যে বাল-উন্মত্তঃ পিশাচবৎ অনুভূত হইবেন তাহাতে সন্দেহ কি? সিদ্ধ মহাত্মাগণ সবসময় এই সব সংসারীদের সমস্ত তাল বজায় রাখিয়া চলিতে ইচ্ছাও করেন না, সক্ষমও হন না। তারপরে তাহাদের একটা বিশেষত্ব এই যে তাঁহাদের কোনও ভাব বা কাজে আমরা আসক্তির ভাব দেখিতে পাই না। এই যে তামাক খাইতে ভাল লাগা, তামাক না পাইলে অতৃপ্তি বোধ করা, সন্দেশ রসগোল্লা খাইয়া একটা তৃপ্তির ভাব অনুভব করা, এইসব আদর্শ জীবনে উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাই না। আদর্শ মনুষ্য যাহা বলেন, প্রায় তাহাই করিয়া থাকেন। 'আপনি আচরি ধর্ম্ম জগতে যাচায়।' যাহাদের কথা ভাব ও কাজের ভিতরে কোনও রূপ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। বুদ্ধ মহম্মদ যীশু প্রভৃতি আদর্শ অবতারের মধ্যে ভিতর বাহিরের কথা ও কাজের সুন্দর সামঞ্জস্য থাকাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। আদর্শ রাজার সমস্ত কর্ম্মচারীগণের অনেকটা আদর্শ ভাবে ভাবিত না হইলে চলে না।

রাজার দৃষ্টি সমস্ত রাজ্যের দিকে পূর্ণভাবে বর্ত্তমান। সেখানে কর্ম্মচারীগণও যেন অনেকটা রাজভাবে ভাবিত হইয়া পড়ে। রাজার ইচ্ছা যাহাতে অবাধিত ভাবে পূর্ণ সফলতা লাভে সক্ষম হয় সেইদিকেই সকলের প্রধান দৃষ্টি। আদর্শ মনুষ্যের ভিতর বাহিরের সব তত্ত্বগুলি আদর্শভাবে ভাবিত হইয়া তাহার দেহরাজ্যে আদর্শ রাজ্যে, ভগবৎধামে পরিণত করিয়া তোলে। তোমার স্বর্গরাজ্য মর্ত্ত্যধামে আবির্ভূত হউক, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ সফলতা লাভ করুক (Let Thy kingdom come Thy will be done), এই প্রার্থনাটির ভিতরেও আমরা এই তত্ত্ব নিহিত দেখিতে পাই। হিন্দু ঋষিগণ অবতারদের জীবনে আধাত্মিক তত্ত্বগুলির পূর্ণ বিকাশ দেখাইতে সচেষ্ট ছিলেন। যাহার ভিতর দিয়া যতটা বিকাশ দেখিতে সক্ষম হইতেন, তাহাকে ততটা আদর্শ অবতার বলিয়া গ্রহণ ও প্রচার করিতে ব্যস্ত হইতেন।

(সামঞ্জস্য বই থেকে)

অপ্রকাশিত পত্রাবলী

শ্রীমৎ প্রেমানন্দ তীর্থস্বামী

শ্রীনগর ১৬/৮/৪৪

স্নেহের হরিদাস — তোমার চিঠি পাইতে সুতরাং উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। আজকাল চিঠি লেখা প্রায় বন্ধ আছে। চোকের জন্য ডাক্তার লিখিতে নিষেধ করেন। তোমার মায়ের কথা খুব মনে হয় — কাছে থাকিলে দেখিতে যাইতাম। ভগবান তাহার কষ্ট দূর করিলে সুখী হইব। মা আমার অভিধানে ভগবতীর জীয়ন্ত বিগ্রহ। ছেলের পক্ষে মায়ের এত কষ্ট দেখা বাস্তবিকই বিশেষ কষ্টকর অথচ কিছু করিবার উপায় নাই। মীনুরও একটা ব্যবস্থা হইয়া গেলে সুখী হইতাম। আমি ছেলেমেয়েদের অবিবাহিত জীবন ভালবাসি না। জীবনের বিশেষ কোনও উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য অবিবাহিত থাকা অন্য কথা। তোমাদের জীবনে উন্নতি ও শান্তি দেখিতে চাই। আমার আশীর্ব্বাদের অভাব হইবে না। গীতা যেন নিবেদিতাকে আমার সংবাদ ও আশীর্ব্বাদ জানায়। তোমার মাকে আমার সংবাদ ও আশীর্ব্বাদ যেন জানানো হয়। প্রাণভরা স্নেহাশীষ লও। শুঃ প্রেমানন্দ

হঠাৎ বিশেষ কারণে আমার হয়তো পূজার আগেই কাশী গিয়া পৌঁছাইতে হইবে।

স্নেহের গীতা (কল্পনা) : তোমাদের চিঠি আনন্দ দিয়াছে। চিঠি লেখা নিষিদ্ধ তাই সংক্ষেপে উত্তর দিব। তোমাদের কথা একটু ভুলি নাই। আশীর্ব্বাদেরও অভাব হইবে না। তোমার ওখানকার মায়ের সব অবস্থা শুনিয়া দুঃখ হয়, আশীর্ব্বাদ তো খুবই করি, কিন্তু ভোগ শেষ না হইলে কষ্ট নিবৃত্তি করা যায় না, তোমাদের অবস্থা বুঝিতে পারি। অমর আজকাল কেমন আছে? তাহার স্ত্রী, মীনু ও তোমরা স্নেহাশীষ লও। হারাণবাবুর শরীর ভাল আছে তো? এমন ভালমানুষের কত কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। শুনিলেও দুঃখ হয়। তোমার — রেণুদিকে আজই চিঠি দিব — তাহার শরীরটা ভাল হওয়া দরকার। আশাকরি তুমি সেবা, ভক্তি ভালবাসা দিয়া সকলকে সুখী করিতে পারিবে। মীনু ভাল আছে তো? স'কলে আশীর্ব্বাদ লও। শু — প্রেমানন্দ

স্নেহের মা রমলা .. বেনারস ২৭/১২/৪৫

বেশ নিয়মমত ভগবানের নাম করিয়া যাও তাঁহার মনের মত করিয়া লইবেন। মনে রাখিও যেখানে প্রেম যেখানে আনন্দ সেইখানেই থাকে প্রেমানন্দ। আমাকে কাছে রাখিতে হইলে আমার সান্নিধ্য উপলব্ধি করিতে হইলে সকলে মিলিয়া যথাসম্ভব শান্তিতে থাকিতে হইবে। কাহারও অসৎ ব্যবহারে আমাদের অসন্তুষ্ট হইবার অধিকার নাই। আমাদের যিনি আদর্শ তিনি এসেছিলেন মার খাইয়া প্রেম বিলাইতে, জীবের জন্য আমাদের cross বহন করিতে হইবে। সব দুঃখকষ্ট নিন্দা অম্লানবদনে সহ্য করিয়া সকলকে ভালবাসিতে হইবে — সকলের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে। সর্ব্বদা সব অবস্থায় শান্ত ভাবে থাকিতে চেষ্টা করিও নতুবা ভগবৎ কৃপা উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাওয়া যায় না। শু — প্রেমানন্দ

বেনারস ২৭/১২/৪৪

মায়েরা — আমার পক্ষে আজকাল সব চিঠির পৃথক পৃথক উত্তর দেওয়া অসম্ভব। এত চিঠি

আসে যে পড়িবারও সময় পাই না, বেশী সময় পূজা নিয়া না থাকিলে শরীর খারাপ হয়। আমার ভগবান চান না যে আমি অন্য কাজে বেশী সময় দেই। তাই আশাকরি তোমরা আমার চিঠির জন্য ব্যস্ত হইবে না। আমি মাঝে মাঝে এক একখানা কার্ডে তোমাদের একজনকে সংবাদ দিব। তাহার নিকট হইতে অপর সকলের সংবাদ পাইতে হইবে। তোমরা সকলেই ইচ্ছা কর আমার শরীরটা ভাল থাকে। এইজন্য আশাকরি তোমরা আমার এই প্রস্তাবে দুঃখিত হইবে না। আমি এক মাসের উপর ২০শে নভেম্বর হইতে ২২শে ডিসেম্বর বিন্ধ্যাচলে ছিলাম। সেখানে আনন্দময়ীর স্নেহে ও যে- এবং ঐ স্থানের জলহাওয়ার গুণে আমার শরীর বেশ ভালই ছিল। অধিকাংশ সময় একটা গুহায় আমি আমার ভগবানকে নিয়া থাকিতাম। সেখানে বহু লোকের ভিড় হওয়ায় এবং এখানে কেহ কেহ দেখা করিতে আসায় এখানে আসিতে হইয়াছে। সকলের অনুরোধ যাহাতে আমি এখানেও বেশী সময় ভগবানকে নিয়া থাকি। একবার শীতের শেষে বাংলাদেশে গিয়া অনেকের সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা আছে। তবে যাওয়া নির্ভর করে সে সময়ের শরীরের অবস্থা এবং যাতায়াতের সুবিধা অসুবিধার উপর। এত আগে কিছু ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। তোমরা সকলে মিলিয়া শান্তিতে থাকিয়া ভগবানের নাম করিয়া যাও। মনে মনে আমার সান্নিধ্য উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিব না। আমার আশীর্ব্বাদের কখনও অভাব হইবে না। ও দেশের যাহারা আমার সংবাদের জন্য বেশী ব্যস্ত হন তাহাদের অনেকে যেন এই চিঠিখানার নকল এবং অপর চিঠির সারাংশ এবং আমার আশীর্ব্বাদ হইতে যেন বঞ্চিত না হন। সকলে মিলিয়া শান্তিতে থাকা চিত্তকে যথাসম্ভব শুদ্ধ ও শান্ত রাখা যথাসম্ভব পরোপকার করিয়া যাওয়া যে আমি কত ভালবাসি তাহা তোমরা জান। আমি মনে মনে কাছে থাকিব। আশীর্ব্বাদ করিব। আশীর্ব্বাদ লও।

স্নেহের মা চারু ...

মনটা একটু শান্ত হইলেই বিশেষ করিয়া অনুভব করিতে পারিবে। আমি খুব আশীর্ব্বাদ করিব। ..তোমাদের সাথে দেখা করিতে আমার কম ইচ্ছা হয় না। তবে তোমরা জান ভগবানের অনুমোদন না পাইলে আমি কোন কাজ করিতে পারি না। যেখানে সকলে সুন্দরভাবে চলিতে চেষ্টা করে সেখানেই আমার ভগবান আমাকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার বিচারে ভুল নাই, দয়ার অভাব নাই। তাঁহার উপরে নির্ভর করিতে পারিলে পরম শান্তিতে থাকা যায়। সকলে প্রাণভরা ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ লও।

শুঃ তোমাদের ঠাকুর

স্নেহের ছবি কানাই, কল্যাণ খুকু ও মঞ্জু — শান্তি সকলের উদ্দেশ্য সেই শান্তি লাভের জন্য প্রত্যেকেরই কিছু কিছু স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন। অপর সকলের সুখে সুখী হইতে চেষ্টা করা আমি বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করি। তোমরা সকলে প্রাণভরা ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ লও।

শুঃ তোমাদের ঠাকুর প্রেমানন্দ

বেনারস ২৭/১২/৪৪

স্নেহের গীতা — চিঠি আনন্দ দিয়াছে তোমাদের কথা একটুও ভুলি না। মীনুর একখানা চিঠি পাইয়াছি, পাইতে যথেষ্ট বিলম্ব হইয়াছে। পৃথক পৃথক উত্তর দেওয়া অসম্ভব। তাহাকে আমার প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ জানাইও। আশীর্ব্বাদের কখনও অভাব হইবে না। বিস্তৃত চিঠিখানার নকল মীনু ও হরিদা'সকে পাঠাইয়া দিও। চিঠিপত্র লেখা আর আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। সকলে মিলিয়া সুখে থাকিতে চেষ্টা করিলেই আমার সান্নিধ্য উপলব্ধি করিতে পারিবে। সকলে আশীর্ব্বাদ লও।

শুঃ ছেলে প্রেমানন্দ

তৎকথনং তচ্চিন্তনং অন্যোন্যং তৎপ্রবোধনঞ্চ

দিদির (চারুবালা দত্ত) নিকট লেখা উষার (উষা দাশগুপ্ত) চিঠির নকল

কলকাতা ২১/১০/৪৮

গতকাল শ্রীশ্রীঠাকুরের ওখানে খুব শীঘ্র যাই। তখন তিনি বসিয়াছিলেন, শরীর বেশ খারাপই। একটি মেয়ে 'মেরে গিরিধারী গোপাল' আমি 'রাসবিহারী কালা' আর সেই মেয়ে ছবি (ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়) সর্বশেষে 'তোমারি গরবে গরবিনী হাম', রমলা 'সীমার মাঝে অসীম তুমি' গাহিল। শ্রীশ্রীঠাকুর যেসব কথা বলিয়াছেন তার মধ্যে খনির গল্পটি ছিল, অনেক সব কথা কার সাধ্য বলে। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ সর্ব্বব্যাপী, এবং তিনি নিজে ঠিক ভাবে সব বস্তুতে তাঁকে দেখেন এবং সব 'মা'দের দেখে কেমন করে আসল মা তাঁকে ভালবাসেন খাওয়ান কথা কন সব দেখেন ও দেখতে পান তা বলিলেন। জীবজগতের প্রতি তত্ত্বে তাঁর অখণ্ড প্রকাশ কি ভাবে উপলব্ধি করা যায়। কেমন করে একটি শব্দ শুনলে ভাবতে হয় কে শব্দ করল কে তা শুনল, কে দেখলো, কে তা দেখালো, সব সেই এক তিনি। এ অপূর্ব মহাতত্ত্ব শ্রীশ্রীঠাকুরের নিজের ভাষায় ভাবে এমন সুন্দর করিয়া বলিলেন যে আপনাকে আভাস না দিয়া পারিতেছি না। একটি কথা তিনি বলিলেন 'আমি' বস্তুটিকে সীমাবদ্ধভাবে যেন দেখিও না। আত্মা শব্দের অর্থ ব্যাপকভাবে বুঝিয়াছ 'ত্বং সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা.. বিশন্তি'। ধীর হইয়া তাহাকে লাভ কর। ধীর কে? যে প্রসন্ন সে। যে পাওয়া না পাওয়া, সুখদুঃখে অবিচলিত ও শান্ত। লীলাদর্শনের ও আস্বাদনের উপযুক্ত সেই ধীর।

কলিকাতা ২২/১০/৪৮

গতকাল সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের ওখানে বেশ আগেই গিয়াছিলাম। আমি 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে' গানটি গাওয়াতে খুব সুখী হইলেন। নিজের চেষ্টায় ভগবানকে পাওয়া যায় না এ সব বলিতেছিলেন পরে একজন ভদ্রলোককে একটা উপনিষদের শ্লোক বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে এখানে লেখা আছে যে অধ্রুব পদার্থের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না আবার অন্য এক স্থানে লেখা আছে ইহা দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায়। তবে ইহা বিরুদ্ধ দুইটি কথা হইল না কি? তখন শ্রীঠাকুর খুব সুন্দরভাবে বুঝাইলেন যে 'সর্ব্বেষাং বিরুদ্ধভাবানাং অপূর্ব্ব সমন্বয়' যেখানে সেখানেই তিনি। মনে কর কাঁটা ফুটিয়াছে সেই কাঁটা অন্য কাঁটা দ্বারা তুলিলে ও ফেলিয়া দিলে তাতে দোষ নাই। অধ্রুব পদার্থের দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না তবে আমরা ওই সব অধ্রুব পদার্থের মধ্যে তাঁহাকে পাই, তাহাদের যখন আমরা শুদ্ধ করি তখন। ফুলটি শুদ্ধ করিলাম চন্দন দিলাম এবং সেই সামান্য বস্তু শ্রীভগবানে অর্পণ করাতে তাহা দ্বারা তাঁকে লাভ করার সহায় হইল। তখন সেই ফুল হইতে তাঁহার প্রকাশও দেখা যায়। কাজেই অধ্রুব পদার্থ দ্বারা তাঁহাকে পাওয়াও যায় আবার অধ্রুব

সকল ত্যাগ দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় এইরূপ শ্লোকে পাইবে। তারপর তিনি বলিলেন যে জীবনে কখনও ভাবেন নাই যে ত্যাগ তপস্যা বা গুণে তাঁকে পাবেন শুধু একমাত্র কৃপাই তাঁহার সম্বল ছিল। তাঁহার মা আছেন সুতরাং চিন্তা নাই। যেমন গোপীরা জানিতেন যে কৃষ্ণ আছেন। তারপর অঘাসুর বকাসুর বধ করিয়া যা করার কৃষ্ণই করিয়াছেন। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্য ন মেধয়া বহুনা শ্রুতেন চ ইত্যাদি। তবে কে পায়? ভগবান যাঁহাকে বরণ করেন অর্থাৎ কৃপা করেন। তবে কি সকলে কি কৃপা পাবে না? তাহা নয়। কৃপা প্রাপ্তির সময় আছে। সময় কখন? না — 'অনর্থ নিবৃত্তি হলে প্রেমের উদয়' — এই অনর্থ নিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ চিত্ত শুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম উদয় হয় না, তাঁর কৃপা লাভ হয় না। মনে কর 'আমার হাতে এক বাটি ঘি। মনে কোরো না আমার ঘি কৃপা দেওয়ার ইচ্ছা নাই। তুমি কাছে আসলে দেখছি তোমার চিত্তপাত্র গোবরে ভরা, ঘিটা তো নষ্ট করতে দিতে আমি পারি না, তাই দেই না।' কৃপা অকৃপার কারণ এই মন্ত্র। (চিঠির এ অংশটুকু পড়িয়া আমার (রমলা বসুর) মনে হইল ঠাকুর চিত্ত যে শুদ্ধ করিব তাহাও তো তোমারই কৃপাসাপেক্ষ — আমার কোন ক্ষমতা নাই।) এমন সময় রমলা আসিল ও গান করিল 'এই লভিনু সঙ্গ তব'।

কলিকাতা ২৪/১০/৪৮

কাল তিনি 'মা আছেন আর আমি আছি' সম্পর্ক খুব চমৎকার করিয়া বুঝাইলেন। যে সব লোক সর্বদা ভাবে এই বিপদ আসিল, এই বুঝি ঐ বিপদ আসিল, এই হইতে পারে — ইত্যাদি তারা ঠিকমত মা আছেন যে তাহা বুঝিতেছে না। মা-ই সব সুতরাং মা যখন আছেন তখন আমার ভাবার দরকার নাই তবে মা -মা করিতে হইবে। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ লাভ কি তাহা লোকে ভুল বোঝে। প্রকৃতপক্ষে ধীরে ধীরে প্রকৃত ধর্ম্ম বোধ — মানবজীবনের প্রকৃত অর্থ কি এই বোধ, কাম অর্থে তিনি আমাকে চান এবং চাওয়া পাওয়া সব তাঁকেই নিয়া, মোক্ষ বোধের উপরও লোকের ভুল ধারণা — সব সুন্দরভাবে বুঝাইলেন। আমার সব বুঝিতে পারাও কষ্ট তবে বুঝিতে পারিলাম 'নির্ভরে পরম শান্তি'। ইহার চেয়ে শান্তি ও আনন্দ ও নিশ্চিন্ততা জীবের আর কিছু নাই। মানুষ কান চোখ মুখ এমন ভাবে রাখিবে যাতে তিনি সাহায্য করিতে পারেন। সর্বদা সংসারের ভিতর দিয়াও সব কথা ও ভাবকে তাঁর অভিমুখী নিলে সেই ভাবে গ্রহণ করিলে তাঁর direction পাওয়া সহজ হবে। তিনি যে সর্বদা দিতে ব্যস্ত। তাহার পর বলিলেন যে তিনি নিজেই জানেন না কেন কাহাকে এবং কেন তিনি বলেন। তিনি মায়ের খেইহারা পাগল ছেলে। যখন বলান বলেন তৎপর মুহূর্তে কিছুই জানেন না গোছের। কোনরূপ নিজের বাহাদুরীর জন্য নিজের দৃষ্টি তিনি দেন না। না বলিয়াই পারেন না তাই বলেন। আরও বলিলেন "...চলে যাবে? আমার কাছ থেকে দূরে, দূর দেশে কেউ যেতে পারে না জান? আমি সবাইকে কাছেই পাই কেন জান? মমাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা এই বোধ সূক্ষ্মভাবে যার হয় সে সব দেখতে পর্যন্ত পায়। যে সব, যে সর্বত্র, সেই সবের মধ্যে নিজেকেও সে পায় সকলকেই সে কাছেই পায়। তোমাদের দূরে যায় মরে যায় ও অন্যত্র যায়। আমার সবাই কাছে।"

২৬/১০/৪৮ কলিকাতা

কাল শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আগেই গিয়েছিলাম তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ, মিশন, বিবেকানন্দ প্রভৃতির

গল্প বলিতে বলিতে বলিলেন যে খুব কম ভক্ত আছেন যে গুরুকে চিনিতে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ভাব কয়জনে আত্মসাৎ করতে পেরেছে? ধারণা করে রাখা বড় সহজ জিনিষ নয়। এক একজনে অবশ্য গুরুকে বড়িয়ে বাড়িয়ে অলৌকিকত্ব দিয়ে বই লেখে (সেটা পয়সার জন্য — তারা বিশ্বাস করে না শুধু লেখে)। একজন গুরুর গল্প করছিল, তিনি নাকি সর্বগুণে গুণী, এমন কি বল হিসাবেও তার অলৌকিকত্ব বর্ণনায় বলল একটা পাঁঠাকে তিনি এক হাতে টিপে বধ করিলেন। এদিকে ভক্ত যে গুরুকে Perfect in all perfection সর্বগুণময় করতে গিয়ে গুরুকেই পাঁঠার সঙ্গে বধ করেছে তা বুঝলো না। যে গুরু এত হৃদয়হীন — সাধারণ মানুষের সে নীচেই। দেখ গুরুকে হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত শক্ত। দেখা তবে পাওয়া। তারপর বুদ্ধের সঙ্গে আনন্দের কথাবার্তা এবং বুদ্ধের শূন্যবাদ যীশুর ক্রুসিফিকেশন সম্বন্ধে বলেন। বললেন যে ব্যক্তি নিজে lower selfকে কতকটা ধ্বংস সংযত করতে না পেরেছে সে যীশুর crucification কল্পনায় কি বুঝতে পারে বল? এ সব অনেক কথা অনেক গান হল। তারপর বিপদের সম্পর্কে মা-ই আসল। তিনি যে খুব ছুঁড়ে উপরের দিকে ফেলেন, খেলার জন্যই, আর তারপর হাত লুফে বুকেই নেন, সে কথা বুঝতে না পেরেই বিপদে আমরা কাঁদি। সাধক সব সম্পর্কে মা কি করছেন তা দেখবেন। সব শেষে বললেন আমি কি চাই তা একটু মায়েদের বলব। আমি জানি আমাদের নারীজাতি মাতৃজাতি যেমন ত্যাগী, সংসারের বাবারা তার চেয়ে কমই। মা-রা স্বামীপুত্রের জন্য ত্যাগ করে কিন্তু সবই বৃথা যায়। দুঃখ হয় তার ফল। কেমন করে ঐ সেরা ঐ ত্যাগ, ভগবানকে করছি ভেবে করলে পূজা হয়ে যায় সেই বোধ তো নাই। এমন কি আমি জোর করে বলছি যদি কেউ এই বোধ নিয়ে স্বামীকে বিশ্বনাথ, পুত্রের মধ্যে গোপাল স্ত্রীর মধ্যে অন্নপূর্ণাকেই দর্শনের ভাবে ত্যাগ ও সেবা করে জীবনে তাকে অন্য পূজা করতে হবে না। অন্ততঃ এই বুদ্ধিতে সংসার কর তবেই পূজা হবে।

২৭/১০/৪৮ কলিকাতা

দিদির প্রেরিত ঊষার চিঠির নকল:—

কাল শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর খুব অসুস্থ দেখিলাম, আমাকে একটা গৌরের গান গাহিতে বলিলেন। ঐ ভদ্রলোক (ফর্সা ও টাক) একটা ভারী সুন্দর গান গাহিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কাল একজনকে 'ভগবান কি বস্তু?' প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন "আমি দর্শন বিজ্ঞানাদির মধ্যে থাকি না। সাধারণ ভাবে বলি তোমাদের ঐ সব কচকচির মধ্যে না গিয়া সহজে ভাব কে ঐ বিদ্যুৎশক্তি যে পাখাটা চালাচ্ছে তারও পরে যাও কোথায় সে শক্তির মূল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চালনার মূলে কে শক্তি, কে আমার কান চোখ মনের আসল শক্তি কার অভাবে আমরা মুখে আগুন দিয়ে বিদায় দিই প্রাণপ্রিয় জনদের — সেই শক্তি — সেই ব্রহ্ম বলে। তারপর তাঁকে জানলেই হবে না, অনুভব করা চাই; লীলাভাবে দ্বৈতভাবে যেমন ধর ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ। কবে অদ্বৈতভূমিতে উঠে তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য **ধীমহি** এই তত্ত্বে যাও। তার পরে ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ করে অবসর। প্রাণ ভরে তাঁকে পাওয়াটাই অনুভব। এখন কথাটা হচ্ছে এই যে কোন বস্তুই নিজে ঐ প্রকার না হলে অনুভবে আসে না, একজন লোক নিজে মহৎ না হলে মহানকে ধারণা করতে পারে না। ধীরে ধীরে এই সব সুক্ষ্মতত্ত্ব অধিকারীর কাছে অবতরণ করে এবং সে সব জানতে পারে। 5th classএ পড়ে M.A.এর বই জানতে চাওয়া ভাল নয়। নিজ নিজ ভূমি অনুযায়ী সাধনা করা

ভাল। আগেই যদি বিচার কর, আগেই যদি গুরু যেহেতু এই সব করেন অতএব চোখে দেখে তাঁকে নকল করতে যাও তবে ভুল হবে। গুরুকে দেখে তিনি যা করেন তাই করবো ভাবা ভুল। তোমার যাতে অধিকার তদনুযায়ী সাধন কর আস্তে আস্তে সব হবে। সাধনতত্ত্বের পর ভজন। লীলাভাবে ছাড়া, খুব আপনার করে তাঁকে না পেলে ভজন চলে না। কেউ কেউ পুত্রভাবে, কেউ পতিভাবে তাঁকে বুকে পেয়ে হয় ভজন। জপাৎ সিদ্ধির জপ জিনিষটাও সহজ নয়। জপের মত জপ করতে হবে তারপর তাঁকে জানার পর তাঁর মত হওয়া তবে তাঁকে পাওয়া।

পত্রপুটে জীবনবাণী

শ্রীমৎ সদানন্দ ব্রহ্মচারী

ওঁ

৩০/১/৯৩

মুঙ্গের

প্রাণপ্রিয় বরুণ,

তোমার সুলিখিত চিঠিখানি পেয়ে সুখী হইলাম। গত দুইতিনদিন এখানে একটু গুমোট ভাব ছিল। গতকাল আমার মনটাও সারাদিন একটা অস্বস্তিতে কেটেছে। যেন কারও কোন অসুবিধা বা অস্বস্তি হচ্ছে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলাম না। কাশীতে কবিরাজমহাশয়ের এখানে লেখাপড়ার ব্যাপারে যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশেই যেতাম তখন কয়েকজন বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল — তার মধ্যে একজন গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় আর একজন শচীন্দ্রনাথ ঘোষ আরও অনেক কিন্তু এই দুজনের সঙ্গে আত্মীয়তা বেশী ছিল। নরেশদার সঙ্গে তো অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতাই ছিল। অনেকেই চলে গেছেন। সম্প্রতি শচীন্দ্রবাবুর কবিরাজ মহাশয়ের সম্বন্ধে লেখা পড়িয়া আমি তাঁহাকে একটি চিঠি দিয়েছিলাম। আমাদের পূজা বইয়ের লেখার সময় শচীনদা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে খুবই আসিতেন। অবসরান্তে বহরমপুরে বাড়ি করে আছেন। তাঁর বাড়িতেও আমাকে নিয়ে গিয়েছেন। তাঁর খবর জানতে চিঠি দিয়েছিলাম। বোধহয় তাঁর কন্যা লিখেছেন তাঁর আর কোন কথা মনে থাকে না শরীর অসুস্থ চলাফেরা করতে পারেন না খুবই অসুস্থ আমার কথা মনে হওয়ায় আনন্দিত হয়েছেন। কিন্তু কিছু লেখার বা বলার সামর্থ্য নাই। আমি অন্তিম সময়ের ভাবনায় অনেকটা চঞ্চল হয়ে পড়েছি। তোমাকে আপনজন মনে করেই এই চিঠিটা লিখছি — বন্ধুদের কাছে বলো না। আমার এই পাহাড় জঙ্গল থেকে আর যেতে ইচ্ছা হয় না কিন্তু এখানেও থাকতে গেলে আমার জন্য দুলুবাবু এবং সলিল তুমি আর সকলেই চিন্তা ভাবনা করেন।

এই শেষরাত্রে তোমাকে এই চিঠি লেখার কারণ এইসব নয়। তুমি শ্রীকৃষ্ণসঙ্ঘবার্তার সম্পাদক হয়েছ — স্বামীজী মহারাজের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র তোমার সম্বন্ধে আমাকে অনেক কথাই বলেছেন। তোমার পিতৃদেবের আমার প্রতি কী স্নেহ ছিল তাহা আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব না। তুমি অনেক কথাই জানিয়াও হয়ত জান না। শ্রীঠাকুরের দেহান্তের পর আমি উদাসমনে ঘুরিতেছিলাম! কার ঘাড়ে বোঝা হয়ে থাকব। রামকৃষ্ণসঙ্ঘ বরাবরই আমাকে রাখবার জন্য চেষ্টা করেছেন কারণ শ্রীমৎ অন্নদাঠাকুর আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন কিন্তু অত গোলমালের মধ্যে যেতে পারিলাম না। আমার এই মনোভাব জানতেন একমাত্র তোমার পিতা। আমি যাহাতে বারাসতে থাকি সেকথা বারবারই বলতেন। কারও বাড়িতে আর থাকতে চাই না বলায় তিনি তাঁর সাধের মন্দিরে আমার জন্য একটি ঘর ও পায়খানা করে দিলেন এক রাত্রি আমাকে বাস করাইলেন। আর বারাসতের বাড়ীর যে অংশ তুমি ভদ্রলোকের কাছে বিক্রী করিয়াছ সেইখানে তিনি লাইব্রেরী আমার থাকার ঘরের যে নক্সা করে পাঠিয়েছিলেন তাহা হয়তো তোমার কাগজপত্রের মধ্যে এখনও রহিয়াছে। কিন্তু সে সব তো এখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে। তথাপি বারাসতেই থাকিব ঠিক করে সব ব্যবস্থা হইল। কিন্তু আমার অদৃষ্টের ভোগ কে খণ্ডাইবে বল? বারাসতে .....ভাইয়ের পর শ্রীমান .....রের আমার নানা দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও আমাকে ভালবাসিত যথাসম্ভব সেবায-উপকার করেছে তার ঋণ শোধের ক্ষমতা আমার নাই। কিন্তু আমার শরীরটা অসুস্থতার কারণে আমি তার পুত্রের উপনয়নে যেতে পারলাম না বলে সে আমার সব সম্পর্ক ত্যাগ করেছে! আমার সম্বন্ধে একদম উদাসীন। আমার জীবনে এইরূপ ঘটনা বেশী হয়েছে বলে মনে করিতে পারি না। ছোট খাটো ঝগড়া বিবাদ হয়ে থাকবে কিন্তু ‘কাছে থেকেও রইলাম দূরে’ এ কথাটি মনে করিতে পারিতেছি না। যাক সে সব কথা।

এবার এখানে এই পাহাড়ের তলে এসে এই সব ভাবনা চিন্তা ছেড়ে ভাবছিলাম দুলুবাবু যদি আমাকে এখানে থাকার অনুমতি দেয় তবে আমি এখানেই থাকব। দুলু সানন্দে রাজী।

তোমাকে চিঠি লিখবার পূর্বে প্রাচীন স্মৃতি মনে জাগে। স্বপ্নে রাত্রে দেখি তোমার পিতা সুস্থ সুন্দর চেহারা আমাকে যেন কত কি তিনি বলিলেন সব কথা মনে নাই। শ্রীঠাকুরের অসুস্থতার সময় ওয়াটল সাহেব মুট্টুসাহেব তাঁহারা নিতে চেয়েছিলেন তিনি বলিলেন বাংলার শরীর বাংলাতেই যাইবে। শ্রীকৃষ্ণসঙ্ঘের বইপত্র অনেক নষ্ট হয়েছে তাঁর লেখাও সব রক্ষা করা যায় নি তবু স্থান ..পরিবেশ ঠিক না হইলেও যে লাইব্রেরীটা রক্ষার জন্য মল্লিকপুর থেকে আরম্ভ করিয়া অন্ততঃ ১০/১২বাড়ী ঘোরাফেরা হইল অনেক কাগজপত্র নষ্ট হইল তাহা রক্ষার তো আপাতত একটু স্থান হইল। পরে তাঁর ইচ্ছা হইলে আরও মনোরম জায়গা তো হতে পারে। তুমি যে সঙ্ঘবার্তার দায়িত্ব নিয়াছ ইহাতে আমি অত্যন্ত আশাবাদী হইয়াছি। অমিয়বাবু শ্রীমান সলিলরা যদি শ্রীকৃষ্ণসঙ্ঘের দায়িত্ব না লইত তাহা হইলে কি হইত জানি না এখন দেখিতেছি সবই তাঁর কৃপায় হইতেছে। তোমার পিতার স্নেহাশীর্বাদ আমি সতত অনুভব করি। তোমার মাকে আমার প্রণাম জানাইও। তোমরা সপরিবার সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। শ্রীভগবানের চরণে তোমাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি। রাত্রি প্রভাত হইল। পাগলের

প্রলাপ আপাতত এখানেই সমাপ্তি।

আশাকরি রেখামা আমার মেধা বাসু দাদুদ্বয়সহ ভাল আছে তোমার শরীরও ভাল। শুনিতেছি দুলুবাবু বিশেষ কাজে নাগপুর গিয়েছে সেখান থেকে এখানে এসে ভাইজাগে কয়দিন থেকে আমাকে নাকি ভুবনেশ্বর ও পুরী দেখাইয়া কলিকাতা নিয়া যাইবে।

'রাজী হেয় হাম উসীমে জিসমে তেরা মঙ্গল হোয়' Let Thy will be done.

তোমাদের শরীর ও মন ভাল থাকুক শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে এই প্রার্থনা করি।

ওঁ যোগনিবাস দার্জিলিং
৮/৬/৭৬

রমলা মা, আপনার চিঠি পাইলাম। পথশ্রম অবশ্যই দূর হয়েছে কিন্তু মনের অস্বস্তি একটুও কমে নি। প্রিয়জনরা যদি সর্বদা দুর্ভাবনায় অশান্তিতে থাকে তবে নিজে কি খুব বেশি শান্তিতে থাকা যায়? আমার কিছু করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও — সলিল মনিমা পিকুদের আকুলিব্যাকুলি প্রাঅণস্পর্শ করে। শ্রীভগবান চরণে শুভপ্রার্থনা সর্ব্বান্তঃকরণে করি।

শ্রীমান বাবুসোনা শক্তিমা আশাকরি ভাল আছে। সব ছোটদেরে প্রাণভরা স্নেহাশিস জানাই।

এখানে পাহাড়ীমা ও প্রফুল্লদাদাও অসুস্থ আর এখানকার বর্ত্তমান আবহাওয়াও কুয়াশাচ্ছন্ন।

শ্রীভগবান সকলের মঙ্গল করুন এই প্রার্থনা। আপনাদের চিঠির প্রতীক্ষায় থাকি।

শুভার্থী সদানন্দ

কবিতা

এসেছি যে

শ্রী অভয়

তোমার কাছে এসেছি যে
ভয়টা কিসের আর।
ভবের মালিক তুমি যে মোর
পরম আপনার॥
পড়েছিলাম ঝড় তুফানে,
পড়েছিলাম গাঙের বানে।
আপনটানে চরণ পানে
এনেছ এবার॥
তোমার দিকে তাকিয়ে এবার
দেব তোমার জয়।
দেখব, বিশ্ব তুমি ছাড়া
আর তো কিছুই নয়।
এবার আমি তোমার হব।
সদাই তোমার কাছে রব।
অভয় বলে, জীবন নাথ
লহ নমস্কার॥

বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্

Lord as I saw Him

Upendra Nath Dutta

(continued from Barta 45/3)

A saint may not like to reveal himself to others, but his words and actions, correctly stated, will unfold his greatness and place him before others in proper perspective. Virtues cannot lie hidden for all time. The out-let comes through every word a saint utters or everything he does. Fragrance spreads in the air and there is nothing to withhold it. Even saints living on hill-tops are discovered in course of time, and nature assumes a supreme role in this discovery. Infact, it is nature that unfolds the greatness of man and helps all to realise it. Swamiji decided not to become a preceptor to others or start an ashrama for many reasons (already stated) among which his desire not to reveal himself was perhaps one. But could he really conceal his virtues, his greatness from others' view? His way of life – a selfless, dedicated life – his utterances, his actions, his service to people in the shape of improving their moral status – all combined to discover him and the discovery was, I believe, in a sense complete. Those who at all knew him, tried to know how great he was and wherein lay his greatness, although his full stature might not be in everybody's view. Infact, the fullness was perhaps beyond anybody's guess or imagination or realisation. His friends certainly felt that he was a great man but very few of them had little realisation about the extent of his greatness. The Swamiji – I mean the whole of him – will never come within our view, our knowledge about him will remain imperfect in the sense that his greatness cannot be measured by any standard that our limited knowledge provides. The stories I have just told, however wonderful they may appear to be, give only an inkling of his super attainments in the domain of spirituality. They do not also provide any clue to his real learning and supreme realisation of the Divinity-in-working and of the mysteries of this world – mysteries which are partly being explained by science now-a-days and accepted as great discoveries.

Apart from knowing something about his service to humanity, as referred to heretofore, there should be as well some earnestness on our part to ascertain, at least in parts and fragments, his realisation and exposition of the Shastras. I am not, however, prepared to take the least responsibility in this respect, since I am helpless here and have absolutely no idea about the sayings of the Shastras and their implications. I would, therefore, like to rest on the authority of our esteemed friends, Shri Jatindra Mohon Chatterjee and the late Dr. Sashi Bhusan Dasgupta. Jatin Babu, seemingly an indifferent type and always unassuming, is a repository of scriptural learning, and his knowledge and exposition not only of Hindu Scriptures but also scriptures of others including the Parsees, the Sikhs and the Zoroastrians, demonstrate his vast erudition and have made him almost a dependable authority on the religious

niceties of these men. In the latter part of his life, Swamiji used to live with Jatin Babu in his Baraset house at different times just to hear him explain these scriptures to him. Swamiji also liked his company and spoke of him in terms of love and respect. Unlike scholars, specially oriental scholars, Jatin Babu had admirably got rid of any touch of egoism, and that feature of his character drew Swamiji's appreciation. Now, whenever an opportunity came, Jatin Babu used to raise very subtle points from scriptures and wanted solutions from Swamiji and the answers every time astounded Jatin Babu, who only bowed in admiration and acknowledged Swamij's depth of knowledge and realisation. On occasions Jatin Babu also pointed out the apparently strong differences in views and preachings of great reformers of the land, which not unoften, embittered the feelings of their respective followers and created an unholy atmosphere and bewildered the common people as they failed to understand what was what and whom to follow. Swamiji used to smile when he heard Jatin Babu say all this and explained away every difference and every disharmony so nicely that it struck its note in Jatin Babu's heart, and his satisfaction knew no bounds. Swamiji's exposition of Krishnatattwa (Tattwik Krishna and historical Krishna) Kalitattwa and Durgatattwa was, indeed, excellent. Whenever he spoke on Krishna, Kali or Durga, it was so clear and convincing that people present there, felt as if there was nothing more to hear or learn, and they left the place in supreme satisfaction. And we heard Jatin Babu say and say with emphasis many a time that Swamiji's realisation of religion and scriptures had no parallel and he could not think of another man having even a near approach to it. And this realisation, supreme in every sense, came after hundreds and hundreds of years of meditation. It was certainly not an overnight success. It was no magic after all. Infact, I once heard from Dr. Sashi Bhusan that on a hill near Jabbalpore Swamiji pointed out to him a large stone slab at the foot of a very big tree, on which, he said, he sat in meditation for a long time some three hundred years back. God only knows how many of hundreds of years he took to attain this superb excellence in every respect of religious life with which he came this time. In Jatin Babu's words, Swamiji's greatness in the sphere of spirituality could never be measured by common men or so-called sadhus. And he was so calm and quiet in this respect that there was no outside indication to feel how deep was his realisation and how clear was his vision. Infact, not unoften people in their ignorance misunderstood him as they could not have any idea of his greatness. Some people took him to be a sadhu who dedicated his life to the service of the sick. In a sense it was true. He certainly did his best for the sick he came across. He even prescribed medicines for treatment of serious illness like T.B. etc., and cured many patients. Wherever he might be, people thronged round him for medicines and were benefited. These people naturally looked upon him as a great lover of mankind, but had no idea about his spiritual wealth or wonderful realisation of the Divine. One, however, must not be sorry for it, for, Swamiji's service to mankind in whatever shape it might come, was a cloak to conceal his inner greatness which, like a tall tree, spread out its branches on all directions, but never showed

its supremacy on the surface to give even a superficial indication of how great he was or how he became one with the Divinity.

Thus, outwardly a great humanist, a great lover of mankind, whose overflowing affection for the people at large, made him sacrifice every human comfort, Swamiji had his life dedicated to the service of the people. And inwardly, his realisation of the mysteries of Heaven, the depth of his knowledge of the Scriptures and the Subtleties, and his complete identification with the Divinity, made him a superman in every sense, who would hardly yield to assessment by common people. And these outward virtues and inward spirituality (used in its widest and best sense) made him a complete man, rarely to be found among the sadhus of the present age. An embodiment of all sustaining qualities, he was idealism incarnate and a great spiritual force at the same time that did not rest on others' opinion for appreciation but unfolded itself at times, as it thought fit, through words and actions. This is what Dr. Sashi Bhusan, who by his character, attainments and service became a great favourite of the Lord, used to say often and on, and his opinion had its force in ascertaining how the saint stood in the eyes of his friends and followers. Swamiji saw Sashi Bhusan as a boy and he possibly noticed in him the beginnings of greatness. Sashi Bhusan had his true shape in the hands of Swamiji and acquired virtues commonly attributed to great men and definitely beyond the reach of ordinary people of this world. I saw him at close quarters for about thirty years and was not a little surprised to see his strength of attributed to great men and definitely beyond the reach of ordinary people of this world. I saw him at close quarters for about thirty years and was not a little surprised to see his strength of mind and supreme confidence in Divine dispensation even in the midst of adversities. How strongly he reacted against anything undesirable and how firmly he tried to stand on his solid moral base against odds, were spoken of by Swamiji himself as excellent features of his characters that remained unimpeachable throughout and earned him a good name that stoutly upholds his greatness in the comity of teachers, professors and the like people. Anyone who knew him, knew how lovely and amiable he was, and how his heart bled at the suffering of others. People also knew with what firmness he always wanted to remedy the evils that surreptitiously crept into our society and vitiated it in all possible ways.

Swami Premananda Tirtha

Life Sketch and Letters

Omkarnath Muttoo

(Continued from barta 45/3)

Three Modes of Love--Love and Service are mainly of three kinds according to the disposition of the individual. Love that grows from mean, selfish desires *(tamasik)* is found in the people of depraved nature. It is an impediment to advancement, acquisition of knowledge and performance of duty. A person of this category neglects his parents and all other relatives. He sinks into the well of delusion and wishes to drown his dear ones also in the sea of ignorance. Passionate *(rajasik)* love

makes a man restless. A person of this category tries to enslave his beloved for his own gratification. He does not care for the difficulties and downfall of those whom he loves. A passionate person jumps into fire like a moth. These stupid and passionate varieties of love are known in the world as Attachment,Illusion, Delusion, Fondness, Lust, etc. In the Gita, it has been described as a 'huge eater', a 'big sinner' and 'an enemy'. The category of love above this, is righteous and pure (sattyk). This has been stated in the Gita as 'illuminating and stainless'. It helps in the acquisition of knowledge and peace of mind. A pure lover, along with his own happiness, keeps an eye on the happiness of the others too. Sometimes he would suffer trouble to make others happy. Pure love, even though excellent, is still within the limits of the three fold attributes *(trigun)* of Nature *(prakiti)*. Real love is transcendental, attributeless (gunatit). The attributes of Nature cannot touch it. It manifests itself in the pure and calm mind of a godly person in the form of God's love. Ungodly and the so-called learned persons, for want of spiritual discipline and inability to relish this superb principle, have propagated, in the world, their own faulty tenets about this love. Transcendental love being rare in the world, we should try to make our love pure and uncorrupt as far as possible. I cannot believe that if anyone, drawn by his love for me, neglects serving his parents and doing other duties, and comes over to me, really loves me. If you have understood my ideas, then my love will stimulate you to do your duty, love your dear ones and to love God who abides in the world in human form. In one word, whatever you do with a godly mind for your own uplift or for the upliftment of others, to fulfil the will of God and to do your duty, will satisfy me and will be treated as service to me. It is quite impossible that service to me may stand in the way of service to others or turn one away from doing his duty.If you have now understood the secret of service and have a desire to serve me, then start serving me in the manner described above. Do you realise how much pain you cause me when you give trouble to anyone, ill-behave towards anyone, speak bad words to anyone or think wrongly about anyone ? Is it not your duty to satisfy one who wants nothing from you except your own advancement and happiness?

Non-attachment-- A person cannot enjoy a thing until he is free of all association in relation to that thing. A rich man who cannot spend money on laudable objects, is a captive of wealth. He has no doubt accumulated money but he has no authority over it. He is the slave of his wealth. In the same way, a lustful person understands his wife in a very small measure. One who is a slave of form, becomes attached to a part of the physical body. Not to speak of enjoying the subtle and causal bodies, he cannot see the other aspects of the physical body even. This is true of other objects of senses too, such as sound, touch, etc. Attachment shatters and greatly limits our feeling of enjoyment One who is attached to anything, wishes to keep the object of his love bound over to him and himself gets bound by it. The course of action of an emancipated person is unlim-

ited. His enjoyment extends upto infinity. He sees and enjoys very much more, and the one whom he sees and enjoys, is also attracted towards him. A true lover cannot remain satisfied without giving complete liberty to his beloved. Possibly, for this reason, God, the supreme lover has given us so much liberty that He does not mind even if we forget Him and do not accept His presence. Indeed, it is impossible to acquire the power of enjoyment without first being liberated and brave. "None but the brave deserve the fair". Incineration of Cupid by Mahadeva is a proof of that. Otherwise the thought-currents of each other cannot reach the highest pinnacle.

Dharma (dharma)-- Dharma means development of all the human qualities and faculties while keeping one's thought-currents in a state of harmony. A righteous man does not believe in too much attention in one direction and neglect of duty in another. I cannot esteem a woman as ideal if her love comes in the way of her husband's duties towards the latter's parents, brothers and friends. There is but one soul pervading all. Attention should be kept towards the serene, harmonious and all-pervading SELF. There-after, by a resolute mind, we should perform the duties sanctioned by religion towards every one in accordance with the garb we have put on. The root of Dharma is harmony.

Impartial View (samadarshan)--The ideal is to acquire the power of viewing things impartially everywhere. Here viewing impartially does not necessarily mean looking upon everyone as the same in the worldly sense. It will be altogether immoral if a woman were to behave with all men in the same manner as she would do with her husband. A government cannot get on successfully if an ignorant worker were seated in the place of a wise minister. Impartial view means seeing in all the one,the Eternal, the Supreme Spirit; developing the idea of looking upon all as our own self and thereafter devoting ourselves to the welfare of all as far as possible. For example--all the organs of our body are dependent upon one body and one soul. Each organ performs a different function, yet our sympathy and feeling for all the organs is the same and no organ does any harm to the other. Similarly, in human society, if we keep our eye on God and along with our evolution, help in the evolution of others, then much of the strife and discord of the world would vanish and Heaven would descend on the mortal Earth. Want of attention towards the impartial and calm Shiva (God) residing within, is the root cause of unrest in the world.

Those who try to approach me by action, thought or spiritual discipline reach very near to me.Do not forget that to love all means loving me and to serve all is my service. Do not consider myself confined to this body alone. The soul is eternal and allpervading. I wish to eat through the mouths of all and be happy in the enjoyment of all. If you wish to feed me, feed the poor, the hungry, your dear ones and eat yourself. Try to satisfy me by being happy in all circumstances.

সন্ন্যাসীদাদাকে যতটুকু পেয়েছি

সুবিমল রায়

(গত শতাব্দীর স্বনামধন্য বাঙালীদের মধ্যে সাহিত্যজগৎ ও মুদ্রণশিল্পের প্রবাদপুরুষ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র সুবিমল কুড়িটি খাতায় যে তত্ত্বকথা লিখেছেন তা শ্রীকৃষ্ণসঙ্ঘের সংগ্রহশালায় আছে। খাতাগুলির প্রথম পাতায় তিনি 'সন্ন্যাসীদাদাকে যেমন মনে পড়ে' কেটে 'সন্ন্যাসীদাদাকে যতটুকু পেয়েছি' লিখেছেন। পরে লেখা আছে 'পেন্সিলে লেখা পুরনো ডায়েরী থেকে নতুন করে লেখা হয়েছে'। মনে হয় এই খাতাগুলি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে মূল্যবান মনে করেই তিনি শ্রীকৃষ্ণসঙ্ঘে এই লেখা গচ্ছিত রাখেন। আমরা তাই স্থির করেছি এই খাতা ধারাবাহিক ভাবে সম্পূর্ণ প্রকাশ করে লেখকের পাওয়া ধনে ধনী হতে চেষ্টা করব। এখন ১৮নং খাতা থেকে লেখা হচ্ছে। —স.)

সেপ্টেম্বর ২৩, সন্ধ্যাকাল, চুনীবাবুর বাড়ি।

সন্ন্যাসীদাদার জ্বর রয়েছে। ২/১জন মাত্র এসেছেন। তাঁকে রবীন্দ্রনাথের এই গানটি শোনালাম, 'পূর্ণ আনন্দ পূর্ণ মঙ্গলরূপে হৃদয়ে এসে —'। পরে কাশীপ্রসাদ রায়চৌধুরী প্রভৃতি এলেন। কাশীবাবু তাঁকে গান শোনালেন, 'তাই কালোরূপ ভালবাসি —'। পরে অন্যেরা কেউ কেউ গাইলেন।

অশ্বিনীবাবুর অসুখের খবর পেয়ে সন্ন্যাসীদাদা তাঁকে দেখতে যাচ্ছেন। দুটি ডাক্তার তাঁকে মোটরে নিয়ে অশ্বিনীবাবুদের বরড়ীতে চললেন।

সেপ্টেম্বর ৩০, ঐ সময়, ঐ স্থান।

মোটরের দরজায় তাঁর ২/৩টা আঙুল পিষে গিয়ে হাত প্রায় অসাড় হয়ে রয়েছে; শরীরও খুব অবসন্ন। তাঁর আনন্দ দেখলে বোঝা যায় না যে তাঁর শরীরে এত বড় একটা আঘাত লেগেছে।

তাঁর কাছে এক বন্ধুর বাড়ীর গাছের কয়েকটা পেয়ারা আর পেঁপে এল; ফলের সঙ্গে গাছের ডালের দুই-তিনটি খণ্ডও ছিল। ফল পাড়তে গিয়ে গাছের ডাল ভাঙাটা সন্ন্যাসীদাদা একেবারেই পছন্দ করেন না। তাই তিনি বললেন, "তাঁদের ব'লে দিও যে তাঁরা যেন এভাবে গাছের ডাল ভেঙে ফল না পাঠান।" তিনি ফলগুলিকে স্পর্শ ক'রে, যাঁদের বাড়ীর ফল তাঁদের আশীর্বাদ জানিয়ে, ফলগুলি তাঁদের কাছেই পাঠিয়ে দিতে বললেন।

৪/৫টি গান হ'ল। তার মধ্যে একটি গান, 'কাজ কি সামান্য ধনে...।'

অক্টোবর ১৪, সন্ধ্যাকাল, নারায়ণপ্রসাদ দাশগুপ্ত মহাশয়ের বাড়ি।

আজ কেয়াতলা অঞ্চলের সি-আই-টি রোডে (P–571,SchemeXLVII) নারায়ণবাবুর বাড়িতে তাঁকে পেলাম। দো-তলায় ছাতে চাঁদের আলোয় সন্ন্যাসীদাদার কাছেই বসলাম। বন্ধুরা তাঁকে কয়েকটি গান শোনালেন। সন্ন্যাসীদাদা নিজের হাতে আমাকে নারকেলের নাড়ু খাওয়ালেন।

অক্টোবর ১৫ — ডিসেম্বর ৩১।

এই বছরের (১৯৫৬) শেষের দুইমাস তিনি কলকাতার বাইরেই কাটালেন। ৬ই নভেম্বর শুনলাম তিনি ঝাড়গ্রাম গিয়ে রয়েছেন। ১৬ই নভেম্বর শুনলাম তিনি বেনারসে আছেন। সামনের রাসপূর্ণিমায় তাঁর জন্মদিন। ৮৫বছর পূর্ণ করবেন। ১লা ডিসেম্বর জানতে পারলাম তিনি পাটনা, আগ্রা প্রভৃতি স্থানে যাবেন। ১৪ই ডিসেম্বর খবর পেলাম তিনি আসানসোল হয়ে ধানবাদ গিয়েছেন। কিছুদিন সেখানে থাকবেন। ডিসেম্বরের শেষ কয়েকটা

দিন তিনি বারাসতে কাটালেন।

১৯৫৭ ৬ই জানুয়ারী, সন্ধ্যাকাল, ৪৯নং চৌরঙ্গী।

সন্ন্যাসীদাদা কিছুদিন বারাসতে কাটিয়ে এসেছেন। তাঁর জ্বর রয়েছে; হার্টে বেদনা। বহু লোক উপস্থিত। তিনি একটি ছোট ছেলের দুই পা টেনে নিয়ে নিজের কপালে ঘসলেন আর বললেন, "শিশুরা তিন-চার বার আমার প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছে।" তিনি একবার পশ্চিমের একটি জায়গা থেকে (খুব সম্ভবতঃ পাটনা থেকে) আসছিলেন। তিনি পথে বেরাতেই একটি ছোট্ট খুকী ছুটে এসে 'মেরে প্যারে-ভাই, যানে নেই দুঙ্গা।' ব'লে ব্যাকুলভাবে পথ আগলিয়ে রইল। তার ব্যাকুলতা দেখে তিনি আর স্টেশনে গেলেন না। পরে খবর পাওয়া গিয়েছিল যে তিনি যে ট্রেনে রওনা হ'তে যাচ্ছিলেন সেই ট্রেন এক ভীষণ দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে।

সন্ন্যাসীদাদা এখন লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটেন।

জানুয়ারী ২১, সন্ধ্যাকাল, নারায়ণপ্রসাদ দাশগুপ্ত মহাশয়ের বাড়ী।

কেয়াতলা অঞ্চলের সি-আই-টি রোডে (P–571,SchemeXLVII) নারায়ণবাবুর বাড়ীতে সন্ন্যাসীদাদাকে পেলাম। মাত্র ৮/১০জন উপস্থিত। সন্ন্যাসীদাদা বললেন, "আমি মৃত্যু মানি না।" গ্রীক মনীষী সক্রেটিসের কথা বললেন। তাঁর উক্তি — "সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করা যায়, এই absract principle (নীতি বা তত্ত্বকথা) সক্রেটিসের জীবনে concretised হয়েছিল (জীবন্ত দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছিল)। সক্রেটিসের শিষ্যেরা আক্ষেপ ক'রে বলেছিল, 'অন্যায় বিচারের ফলে বিনা দোষে আপনাকে প্রাণদণ্ড বরণ করতে হচ্ছে।' সক্রেটিস উত্তর দিয়েছিলেন, 'তবে কি তোমরা চাও যে দোষ করার দরুণ আমার মৃত্যু হয়?' শিষ্যেরা তাঁকে পালাতে পরামর্শ দিলে পরে তিনি বলেছিলেন, 'এমন জায়গা কি দেখাতে পারবে যেখানে গেলে আমার কোনদিন মৃত্যু হবে না?' শিষ্যেরা যখন বলেছিল, 'যে অন্যায় আইনের বলে আপনার বিনা দোষে প্রাণদণ্ড হয়েছে তেমন আইন উঠে যাওয়া উচিত', সক্রেটিস তখন উত্তর দিয়েছিলেন, 'হাঁ, এই আইন উঠে যাবে, কিন্তু আমার রক্তের দ্বারাই এই আইন মুছে যাবে, আমার মৃত্যুর ফলেই তা হবে।' তিনি তাঁর দেহের সৎকারের সম্বন্ধে শিষ্যদের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে তারা তাদের যেমন ইচ্ছে তেমনি ভাবেই সৎকার করতে পারে, কিন্তু মনে রাখতে হবে শরীরটা সক্রেটিস নয়।'

জানুয়ারী ২৪, সকাল প্রায় ৯.৩০, নারায়ণবাবুর বাড়ী।

বেলা প্রায় সাড়ে ৯টায় নারায়ণবাবুর বাড়ী গেলাম। অতুলভূষণ সরকার মহাশয় আর তাঁর পত্নীও আছেন। সন্ন্যাসীদাদা খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন। আমাদের জন্য দুধ আর ফল এল। নারায়ণবাবুর পত্নী সন্ন্যাসীদাদাকে দুটি গান শোনালেন, (১) নামে কত মধু কত সুধা, কতই আরাম —, (২) প্রাণারাম, প্রাণারাম, প্রাণারাম —। পরে অতুলবাবু তিন-চারটি গান শোনালেন। অতুলবাবুকে সন্ন্যাসীদাদা বলেছিলেন, "তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতি তোমার নিজের রচিত গানের মধ্যে দিয়েই হবে।" নানা সৎপ্রসঙ্গ হ'ল।

জানুয়ারী ২৭, সকাল ৮টা, নারায়ণবাবুর বাড়ী।

বৌঠানকে নিয়ে সন্ন্যাসীদাদার কাছে গেলাম। বৌঠান তাঁকে অতুলপ্রসাদের এই গানটি শোনালেন, 'আমারে ভেঙে ভেঙে কর হে তোমার তরী —' পরে রবীন্দ্রনাথের এই গানটি শোনালেন, 'ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে —'। সাড়ে ৯টার পরে অতুলভূষণ সরকার মহাশয়,

তাঁর পত্নী, কন্যা আর জামাতা এলেন। অতুলবাবু গান করলেন। তিনি সন্ন্যাসীদাদাকে নিয়ে শিলঙের পাহাড়ে পাহড়ে বেড়িয়েছিলেন, সেই সব দিনের কথা স্মরণ ক'রে আনন্দ প্রকাশ করলেন।

দুপুরে সন্ন্যাসীদাদা নিজের পাত থেকে প্রথমেই আমাদের প্রত্যেকের মুখে এক এক গ্রাস ভাত-তরকারি তুলে দিলেন ; পরে নিজের স্বল্পাহার শুরু করলেন। আমরা তখন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পাতে খেতে বসলাম। ভাত, অতি উপাদেয় তরকারি, ছেঁচকি, ঘন্ট, তরকারির ডাল, ভাজাভুজি, টোম্যাটোর অম্বল, পায়েস আর ফল সহযোগে সাত্ত্বিক আহারে আমরা প্রভূত পরিতৃপ্তি লাভ করলাম। পরে নারায়ণবাবুর বাড়ির সকলে আহার বসলেন।

আহারান্তে বিশ্রাম নিতে নিতে সন্ন্যাসীদাদা বিন্ধ্যাচলের মহাত্মা ডুমুরুবাবার কথা বললেন। ডুমুরুবাবা কুকুরদের বড় বালবাসতেন। তাঁর জন্য খাদ্যদ্রব্য এলে তিনি নিজের ভাগে কিছু খাদ্য রেখে তার পাশেই বাকী খাদ্যটুকু কুকুরদের জন্য রাখতেন আর একটা অদ্ভুত আওয়াজ করতে থাকেতন। সেই আওয়াজ শুনে কুকুরেরা ছুটে এসে তাদের ভাগের খাদ্যটুকু খেয়ে যেত, কিন্তু ডুমুরুবাবার জন্য রাখা খাদ্যে মুখ দেবার কোন চেষ্টা কর্‌ত না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সম্পূর্ণ অজানা অচেনা কুকুরদের ডেকে আনলেও তারা পর্য্যন্ত শুধু কুকুরদের জন্য রাখা ভাগটুকুই খেত ; ডুমুরুবাবার খাদ্যের ভাগ তাদের সামনেই থাকলেও তারা কিছুতেই ওতে মুখ দিত না। সন্ন্যাসীদাদা বলেছেন যে তিনি নিজের চোখে এই সব দৃশ্য দেখেছেন।

কুকুরদের সঙ্গে ডুমুরুবাবা এক নতুন রকমের খেলা খেলতেন। একটা কুকুরকে ডেকে তিনি তাকে উত্তপ্ত বালির উপরে শুয়ে পড়ত ইঙ্গিত করতেন। তিনি 'লেট যা বেটা' বলতেই কুকুরটা গরম বালির উপরে শান্ত ভাবে শুয়ে যেত, আর ডুমুরুবাবাও কুকুরের গায়ে মাথা রেখে সেই গরম বালির উপরে আরামে শুয়ে পড়তেন। মধ্যে মধ্যে ডুমুরুবাবা একটা কুকুরকে তুলে নিয়ে নিজের ঘাড়ের উপরে উপুড় ক'রে শুইয়ে রাখতেন। আর দুই হাতে কুকুরের সামনের আর পেছনের ঠ্যাং-দুটো ধ'রে নিজের গলার সামনে আনতেন। এই ভাবে কুকুরটাকে কতকটা মালার মতন ক'রে ধারণ ক'রে তিনি হেঁটে বেড়াতেন।

এই মহাত্মার সম্বন্ধে সন্ন্যাসীদাদা আর একটি সুন্দর ঘটনার কথা বলেছেন। একবার একজন সাহেম ডুমুরুবাবাকে ট্রেনে তুলে নিয়ে পশ্চিমাঞ্চল থেকে পুরীর দিকে রওনা হয়েছিলেন। তাঁকে সাহেব জগন্নাথদর্শন করিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। ট্রেন কিউল জংশনে এসে দাঁড়াতেই ডুমুরু লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন আর হিন্দিতে বললেন, 'কেন রে পুরী যাব? জগন্নাথ তো এখানেই আমর মধ্যে এসে গিয়েছেন।' কিউল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ব'সে মহাত্মা সমাধিমগ্ন হয়ে পড়লেন। সাহেব ডুমুরুবাবার হাল-চাল জানতেন, তাই তাঁকে পুরী নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা ছেড়ে দিলেন।

সন্ন্যাসীদাদাকে এখন বিশ্রাম করতে দেওয়া উচিত বুঝে আমরা উঠে পড়লাম।

ক্রমশঃ

রাসপূর্ণিমা

মনোজেন্দু মজুমদার

গুরু শব্দটির প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে আমার চিরকালের একটা বিভ্রান্তি ছিল। আক্ষরিক অর্থে গুরু হলেন তিনি যিনি মনের অন্ধকার দূর করেন। বাল্যে জানতাম বিদ্যালয়ের শিক্ষকই গুরু। কিন্তু আমি তো বিদ্যালয়ে যাবার আগে প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছি আমার পিতার কাছে, তা হলে তিনি কি আমার গুরু? আমাদের কোন কুলগুরু ছিলেন না, তাই তাঁর পরিচয় কখনও পাই নি।

তারপর যৌবনের প্রান্তে এসে আমি এই শ্লোকটির সাক্ষাৎ পাই:

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ
গুরুরেব পরম ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু গুরু মহেশ্বর বা শিব। গুরুই পরম ব্রহ্ম, অতএব সেই গুরুকে প্রণাম করি। এখানে দেখি ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে আসল গুরু বলা হচ্ছে। সেই ঈশ্বরকে কখনও দেখি নি, ব্রহ্মকে কখনও উপলব্ধি করি নি। আমাদের চোখের সামনে মানুষের দেহে যে গুরুকে দেখি তাহলে তিনি কে?

অতঃপর সব বিভ্রান্তির অবসান হল যখন পরমারাধ্য শ্রীঠাকুর শ্রীমৎ প্রেমানন্দ তীর্থস্বামীজীর রচনা সম্ভারের সাথে পরিচয় ঘটল। শ্রীশ্রীঠাকুর গুরুতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে কত অসংখ্য বার লেখনী ধারণ করেছেন তার পরিচয় পাওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণসঙ্ঘবার্তার পুরাতন সংখ্যার পাতায় পাতায়, শ্রীঠাকুরের অপ্রকাশিত রচনা প্রকাশের মাধ্যমে। আমাদের জন্য যে পূজামন্ত্র সঙ্কলন করলেন, তার প্রথমদিকের একটি মন্ত্রে লিখলেন 'ওঁ গুরুভ্যো নমঃ' তিনি যদি এক গুরুর উল্লেখ করতেন তা হলে লিখতেন 'ওঁ গুরবে নমঃ'। একাধিক গুরুর কথা বোঝাবার জন্য বললেন 'ওঁ গুরুভ্যো নমঃ'।

তারপর মন্ত্র দিলেন 'ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥' এখানে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী সর্বভূতে পূর্ণরূপে বিরাজমান সেই পরম ব্রহ্মের কথা বলা হচ্ছে। চরাচরব্যাপ্ত সেই ব্রহ্ম ক্ষর অক্ষর সব বস্তুতে থেকেও তত্ত্বাতীত। ভগবানের সেই পরম পদ যিনি দেখিয়ে দেন সেই গুরুদেবকে নমস্কার। এখানে গুরুদের singular

তারপরের মন্ত্রেও গুরুদেব একবচন, বহুবচন নয় : 'মন্নাথ: শ্রীজগন্নাথো মদগুরু শ্রীজগদগুরু। মম্মাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরুবে নম:॥ এই গুরুর কথা এখানে বলা হল, ইনি প্রতি জীবের গুরু, সমস্ত জগতের গুরু অভিন্ন। তারপরই শ্রীশ্রীঠাকুর কৃত মন্ত্রের ব্যাখ্যায় উদ্ধৃতি আজকের আলোচ্য বিষয়। এইখানে লক্ষ্য করা যায় গুরু এখনে সরাসরি শ্রীভগবান যিনি সকল জীবের মধ্যে সকল বস্তুতে বিদ্যমান, অর্থাৎ একবচন হয়েও বহুবচন। আমরা সেই ঈশ্বরকে প্রণাম করি।

এর পর শ্রীঠাকুর লিখেছেন "মনে রাখিতে হইবে, যে পর্য্যন্ত আমরা সমস্ত বিভূতিমৎ পদার্থকে এমন কি সব জীবকে প্রণাম করিতে না পারিব সে পর্য্যন্ত আমাদের প্রণাম সার্থক হইবে না।"

শ্রীশ্রীঠাকুর গুরুমন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলেছেন তিনি (গুরু) যিনি স্বয়ং ঈশ্বরকল্প তিনি 'অনাসক্ত

অনুরাগী সংসারী সংসারত্যাগী'। 'সংসারী সংসারত্যাগী' সাধনার উচ্চস্তরের বিষয়। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী অনাসক্ত অনুরাগী হবেন সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। তাঁর প্রকৃত অর্থে সংসার নেই, পিছুটান নেই। কিন্তু যিনি সংসারী ব্যক্তি তিনি সংসারী হয়েও সংসারত্যাগী —সে বড় কঠিন প্রস্তাব।

আমার জীবনে দেখেছি চারুমাকে। বৃহৎ পরিবার অনেক সন্তান সন্ততি। সকলের প্রতি অনুরাগী কিন্তু সম্পূর্ণ অনাসক্ত — এই আদর্শের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। আমি দেখেছি শান্তিভাইকে। পদার্থবিদ্যায় কৃতী ছাত্র, যোগ্যতার হিসাবেই তিনি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আমার সঙ্গে যখন দেখা হয়, তিনি কেদারবদ্রী যাত্রী। শ্রীঠাকুরের একান্ত ভক্ত তিনি তখন বলতেন 'বনত্ বনত্ বন্ যায়ী'। তিনি সত্যই একদিন লোকালয়ে থেকেও অদৃশ্য হলেন। আমি একজন আমেরিকার শিক্ষিত ডাক্তারকে জানতাম (আমার বাল্যবন্ধু) যিনি বলতেন 'দেশে বিনামূল্যে চিকিৎসা হয়তো পাওয়া যায় কিন্তু বিনামূল্যে চিকিৎসক পাওয়া যায় কি?' তিনি প্রায়ই ট্রেনে চেপে গ্রামে গিয়ে রুগী দেখতেন বিনা পয়সায়। একদিন এই গ্রামে গিয়ে কর্মরত অবস্থায় তাঁর হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হয়ে গেল। এরা আমার দেখা সংসারী সংসারত্যাগী।

যাহারা ভগবানকে চায় ভগবানও তাদের চান। ভগবানের কাছে যাইতে ভক্ত যত ব্যস্ত ভক্তবৎসল ভগবান তাঁহার প্রাণের ভক্তকে তাঁহার কাছে টানিয়া নেওয়ার জন্য কোটিগুণ ব্যস্ত। অথচ বিধাতা বিধানকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। তিনি কর্ম্মানুসারে ফল দান করিতে তৎপর। চিত্ত শুদ্ধ শান্ত না হইলে ভগবৎ দশন, ভগবৎ অনুভূতি, ভগবৎ সান্নিধ্য লাভ অসম্ভব। এইজন্য ভগবান ভক্তের কোনরূপ দোষত্রুটি মলিনতা স্বাথপরতা সহ্য করিতে পারেন না। তিনি ভক্তের হৃদয়ে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া সমস্ত ময়লা আবর্জ্জনা দূর করিতে শশব্যস্ত। কোথাও তিলপরিমাণ অভাব তিনি সহ্য করিতে পারেন না।

— শ্রীমৎ প্রেমানন্দ তীথস্বামী

মুখ্যসচিবের নিবেদন

আজ ১০ই নভেম্বর ২০১১ শ্রীশ্রীমৎ প্রেমানন্দ তীর্থস্বামীজী মহারাজের ১৪০তম আবির্ভাব তিথির উৎসবে সবাইকে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম ও আন্তরিক শুভেচ্ছা।

দুঃখের সহিত জানাই যে আমাদের ভক্ত সদস্যা গীতা দত্ত (২৩৭ এল) প্রয়াত হয়েছেন, তাঁর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। যারা নতুন সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন তাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বারাসত শাখার অকালনিবাসের ঠাকুরঘরের সমস্যা মেটানো সম্ভব না হওয়ায় আমাদের পরিচালন সমিতির শ্রীআলোকনাথ চক্রবর্তী ও শ্রীঅমিতাভ বসু পদত্যাগ করাতে আমরা ভীষণ ব্যথিত হয়েছি। পদত্যাগপত্র ফেরত নেবার জন্য তাঁদেরকে অনুরোধ জানাই। মিলিত প্রচেষ্টায় সব সমস্যার সমাধান করা যায়।

শিশুপাঠশালায় ছাত্রছাত্রীসংখ্যা ক্রমশঃ নিম্নগামী — তার প্রতি সবাইকে মনোযোগ দিতে আহ্বান জানাই।

লাইব্রেরীর প্রাত্যহিক কাজ সঠিকভাবে চালানোর জন্য একজন অভিজ্ঞ বেতনভূক কর্মী নিয়োগের চেষ্টা করা হচ্ছে। সংঘের সদস্যবৃন্দ থেকে কেউ এগিয়ে এলে সবচেয়ে ভালো কাজ হবে। সবাইকে অনুরোধ জানাই এই কাজে কিছু শ্রমদান করুন এবং পড়ার সুযোগ গ্রহণ করুন।

মেসার্স এস. ঘোষ এ্যান্ড কোম্পানী অডিটরকে ধন্যবাদ জানাই, বহু কর্মব্যস্ততার মধ্যেও বিনা পারিশ্রমিকে আমাদের আয়-ব্যয়ের বিবরণ পরীক্ষা করে দিয়েছেন। কোষাধ্যক্ষ বিশদ বিবরণ দেবেন। সদস্য তালিকা পুস্তক নতুন সংস্করণ ছাপানোর প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে।

শ্রীমতী গোপা রায় এবং কতিপয় সদস্যদের অনুদানে শ্রীকৃষ্ণসঙ্ঘবার্তা ও পুস্তক ছাপানো সম্ভব হচ্ছে তাঁদেরকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

প্রত্যেক পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দদের অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁরা যেন অন্ততঃ সপ্তাহে একদিন (বুধবার বিকালে এবং রবিবার সকালে) শ্রীকৃষ্ণসংঘে উপস্থিত থাকেন। লোকাভাবে অনেক কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়ে উঠছে না।

ইহার অন্যথায় সমিতির সদস্যপদ গ্রহণে মনোযোগ একান্ত প্রয়োজন।

সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে নিবেদন শেষ করছি।

বিনীত

খগেন্দ্রকুমার (শংকর) গোস্বামী

সম্পাদকীয়

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎ প্রেমানন্দ তীর্থস্বামীজী ১৮৭১সনে রাসপূর্ণিমায় অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলায় বাটাজোড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতৃআজ্ঞায় তিনি কলিকাতায় বি.এ পড়া শেষ করে হিমালয়ে চলে যান গুরুর সন্ধানে সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য। হিমালয়ে এক মহাত্মার সাথে তাঁর দেখা হয় এবং তিনি বলেন গুরুর সন্ধান না করে তুমি দেরাদুনে চলে যাও সেখানে মেথরপট্টিতে কলেরা রোগে বহু লোক মারা যাচ্ছে। সেখানে কৃষ্ণানন্দ নামে বছরখানেক থাকেন এবং ওখানকার স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তারপর কাশীতে সন্ন্যাসগ্রহণ করে নতুন নাম প্রেমানন্দ তীর্থ নেন। ১৯৫৯এ ২রা মে কলিকাতাতে তিনি দেহত্যাগ করেন। এই ৮৮বৎসরের বেশীর ভাগ সময় তিনি কাশ্মীরে থাকতেন। কিন্তু ১৯৪৭সন থেকে বাংলাদেশেই (পুরী ও বারাণসী সহ) থেকে যান। কারণ হিসাবে বলতেন তাঁর শরীর বাংলাদেশেই তৈরী হয়েছে এবং দেশভাগ হওয়াতে মানুষের যে কষ্ট হয়েছে সেজন্য শেষ জীবনটা তাদের সঙ্গে এ দেশেই থাকবেন।

তাঁর সঙ্কলিত 'পূজামন্ত্র' সমবেতভাবে ও একক পাঠ করার কথা বলতেন এবং বিশেষ দিনে সমবেত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করাতেন। তাঁর ভক্তরা এবং ভক্তদের পরবর্তী প্রজন্মেরা সেই নির্দেশই পালন করে চলেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর মানসপুত্র শ্রীমৎ সদানন্দজীর কথা অবশ্যই বলা প্রয়োজন। তিনি যজ্ঞমন্ত্র বই প্রকাশ করেন এবং বহু ভক্তের বাড়িতে বাড়িতে যজ্ঞানুষ্ঠান পরিচালনা করেন। সদানন্দজীর সভাপতিত্বে প্রথম শ্রীকৃষ্ণসঙ্ঘ গঠিত হয় এবং শ্রীকৃষ্ণসঙ্ঘবার্তা ১৯৬৬সন থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথমে বছরে ২টি সংখ্যা — শ্রীশ্রীঠাকুরের তিরোধান ও আবির্ভাব তিথিতে প্রকাশিত হত। এখন বছরে চারবার শ্রীমৎ সদানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব ও তিরোধান দিবসেও প্রকাশিত হয়।

সংঘবার্তার বেশীর ভাগই শ্রীশ্রীঠাকুরের লেখা এবং তাঁর বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। এখন শ্রীঠাকুরের লেখার পরেই শ্রীমৎ সদানন্দজীর লেখা প্রকাশ করা হচ্ছে।

এবারে ৪৫/৪সংখ্যাতেও সেই ক্রমই রক্ষা করা হয়েছে। এখন প্রায় সব বই সদানন্দ-অছি-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণসঙ্ঘের ছাপাখানা থেকেই মুদ্রিত হয়। তবে এই সংখ্যায় বেশী কিছু রচনা দেওয়া সম্ভব হল না — তার জন্য আমাদের অক্ষমতা ও যান্ত্রিক ত্রুটি দায়ী। তাই আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। অলমিতি।

Amrita-Kalyan-Vani

Srimat Premananda Tirthaswami

* The Universe is alive — it is an image of Him. If we raise the Universe we raise our soul. It is His wish that we see Him in His Universe.

* Our primary goal should be to bring a unity between our bodies, mind and soul. And thus we should be aware of all three aspects of everything we do, the physical, mental and spiriual.

* He manifests Himself as the physical Universe. The inner soul of this Universe is Him.

* He manifests Himself in the physical, mental and spiritual realities that we experience. He fills all these spheres of reality with beauty, bliss and joy so we always keep His abode where we may achieve eternal joy in our minds.

* If He were not permeated through this Universe in such a manner then indeed this existence would be meaningless and a lie.

* If He is at the basis of this Universe, if this is all made up of Him, how can all this be a lie. This is why the magic of this creation is not a mirage. This is rather, His manifestation.

* He continually plays His game of building and destroying this Universe. When He creates, this Universe comes out of Him, then after He plays with it for a while, it merges back into Him in destruction.

* This continuous rise and fall of the motive energy, the cycle of creation and destruction, announces His presence. In the same way that eternity can be imagined in the cycle of day and night, the unchanging can be glimpsed in the cycle of past and future, so this playing and rest, this action and inaction explains the theory of love and action, of service and consciousness.

* This rise and fall completely describes this Universe. As the Universe is in it's entirety created by Him, both the creation and destruction is a source of joy for us.

* Creation and destruction, life and death are like the waves. If the water rises in the wave, it has to come down. Until this rise and wall stops it is not possible to see the calm water. There are those who see this rise and fall as the true nature of water. For them this game will never end.

* We are eager to get to His abode, He is many times eager to take His loved ones there. Our distress is very difficult for Him to see. He really cannot be without us.

* Is it not amazing that we can claim that He cannot be without us? That we help His game, His activity. How amazing is His blessings that we can say this.

* The more we can rise, the more we can see Him and enjoy.

(Translated by Suvendranath Dutta)

YAJNA-TATTWA

Srimat Premananda Tirthaswami

What is Yajna?

To savour the joy in the creative activity, the sacrifice of the gods to help others savour that joy and the gift matter and idea aimed towards the gods, that is Yajna. So Yajna is both *Purushmedh* and *Naramedh* – that is the creation, maturity and evolution of all personal individual matters (*Tat*) to the Ultimate Singular Form (*Twang*) and then the mystery of reversal of that Ultimate Singular Form to the personal individual matter. The inter-play between the '*Tat*' and '*Twang*', the masculine and feminine, of life and water – the basis of life, of food and the provider of food, spirit and matter – this consists of the theory of the Yajna. It is the composite of creation, stability and destruction.

To the one who has attained divine grace, Yajna *is Kevalaatmak* – experiencing the Brahma everywhere; for the person who meditates, Yajna is *Bhaavaatmak* – to experience the Brahma and His activities, encompassing every concept dealing with self and the world individually and collectively; for the initiator, Yajna is *Dravyaatmak* – to purify the mind with corporeal matter of the material body.

Yajna:- To purify and clear all preconceived notion from the three aspects of the body, then to fill them with divine ideas, fortify them with divine strength to enable them to perceive the Lord everywhere. All ceremonies that assist in the playful activities of the Lord are known as Yajna. Almost all incarnations of the Lord (*Avatars*) have tried to remove all the foreign filth from the theory of Yajna to reinstate it in its original form. *Yoga* Yajna, *Japa* Yajna, *Swaadhyaay* Yajna, *Naamkeertan* Yajna are different consequence of those endeavours. Let us now see how the Shaastras enlighten us about Yajna.

1.Yajna is the Lord Himself:- "*Yajno vai vishnuriti*", "*yajati vidwati rijyate waa sa yajnah parameshwarah*". The One who adds all things together and is worshipped by all learned people, that All-pervading Ultimate Being is Yajna. To realise the Lord in every concept, every action of the world, to perceive the theory of the Brahma in every inflection, every aspect of every action, that is Yajna. It is essential to think on the mantra "*Brahmaarpanang Brahmahavih*". Brahma must be perceived in the fire, the offering, in the priest. This concept of realizing the presence of the idea of Yajna in all forms, all concepts, all actions is preached in the Mahabharata too. "*Yajno yajnapatiryajnee yajnaango yajnavaahanah*" "*Yajnabhrit yajnakrit yajnee yajnabhuk yajna saadhanah*".

Yajna means Vishnu – to perform the yajna is to achieve divinity. The world of living

beings is the image of the Lord, to serve every being through their world is the Lord's prayer and that prayer is Yajna.

2. Yajna is the main ceremony of the Vedic Sages:- All collective actions to save all living beings from calamities like too much or too little rainfall, war and strife, anarchy, plague etc. was generally known as Yajna. As a result of performing these Yajnas people would be able to unite and establish peace in the country. The ceremony of the Yajna, the mantras of the Yajna, eating of the remaining offering from the Yajna, all these were means towards this unity. Yajna would awaken the slumbering force of the nation, unite all good qualities of every individual and enable everybody to work towards the true welfare of the country. Whatever would drive away the arrogance, selfishness and the differences formed thereby, merge the individualistic ideas into the collective, unite all beings so that they are capable of appreciating the Theory of Individual State that in general was known as Yajna.

3.Yajna is skilful action:- Action is responsible for creation, the world moves by actions. Thus it is necessary to perform various actions to at least remain alive. When the wise men forgot the actual significance of work, started thinking of work as a kind of bondage and became impatient to renounce everyday life to become a saint, in that situation, much benefit was derived by all from Yajna. It showed the true nature of actions, it showed that work actually assists in realization of the Lord and in achieving ultimate freedom by working without any hope of results, by considering work only as a means to perform Yajna. Yajna imparts the wonderful skill of transforming work that is done with a purpose to work that is done for the sake of work without a thought of its result, to transform work done because of need to work done for its own ideal, to transform work that binds us to work that free us, to transform unpalatable work into fine, interesting work that is full of happiness, to transform the desired into the preferable, better and desired and finally to transform the work of the living being into the work of the Lord. We see the wonderful skill of picking the sharp *Kush* grass without cutting our hands, how to remain within an everyday life without being bound by it, how to feel affection without being addicted, be within the world and yet renounce its ties through the theory of Yajna. Instead of ordering people like bosses, arguing like learned men, Yajna leads man like a lover, unknowingly from the *Dravyaatmak Yajna* to the *Jnaatmak* – the state of knowledge through the *Bhaavaatmak Yajna*. Yajna is the wonderful skill that leads us unknowingly from sensual enjoyment to sacrifice, from need-based work to working for its own sake and from the worldly life to achieve divinity. It assists man to reach the Ultimate goal at the feet of the Lord by misleadingly tempting him through his own desires; it dangles the selfish pleasures as bait and then slowly helps one realise that happiness of self is inseparable from the happiness of others and thereby tempts one to serve and make everyone happy. We see a wonderful synthesis of self-interest and interest of others in the Yajna.

4. Yajna the debt-repaying act – Sacrifice:- The Lord started performing the Yajna after sacrificing Himself. This is why there is an aspect of sacrifice in every instance. The society, the world does not function without sacrifice. The theory of personal faith (*Swadharma tattwa*) as stated in the Geeta preaches this. We are indebted to all men, animals, birds and insects – all living beings, all elements and all gods. We may in fact be called robbers if we accept loans from everybody and then make no effort to repay them by doing something for them. Through the *Dravyayajna* and the *Bhaavaatmak* yajna we get a chance to repay this loan. We may find a beautiful method of repayment through the five great Yajnas performed by the ancient Hindus. Every living being is the Lord in another attire, a living image of the Lord. We need to have a corporeal self to approach one with a corporeal body, to perceive the Lord through every living being is simple, natural and beautiful; this is why for Hindus, to serve a living being is to serve the Lord. The main form of prayer, Yajna for the Hindus was to serve all living beings unselfishly and to remain working towards the good of all people. The main form of meditation in the life of a Hindu was to perceive, meditate and serve the Lord through all living being. It is customary to recite a benedictory chant (*Swastivachan*) before starting any ceremony. It is not possible to enter the Kingdom of the Lord while remaining indebted to even one being. So it is necessary to placate everybody, to take everyone's permission through service, through a prayer that benefits all, to get everybody to chant '*Su astu*', may this work of mine prosper – *Ayamaarambha Shubhaaya bhavatu* – let this ceremony benefit all – only after hearing this chant, after requesting for blessings from all, may any auspicious ceremony begin. Treachery and ingratitude are the worst sins in the lexicon of the Hindus. Even the earth should not bear the burden of an ingrate. "*Upakaarini vishraddhe yah samaacharatipaapam. Tang janam-satyasandhang bhagavati vasudhe kathang vahasi.*"

5. All work is Yajna:- The significance of the saying that all work is Yajna is that the Vedic Sages believed and had realized that all work may be transformed into prayer or Yajna. The aim of their life was to transform the whole world into a garden of the gods (*Nandankaanan*), to transform all words into the Vedas and to transform all ideas into meditation. They completely believed that "*Sarvang khalwidang Brahma*" – all matter, all concepts that seems like *Idang* are actually an evolution, a conclusion of the Brahma, at the end of all meditation, all prayer they resolve into the Brahma. They would advise to work in such a way that all actions would terminate in Yajna, prayer, meditation and worship. In a far-reaching meaning, Yajna means all actions, in a narrower context, it is sacrificing various sacrificial material to the gods – renunciation of materials. There are two kinds of actions – the work of the Lord and the work of living beings. The work of the Lord is *Purushmedh*, the work of the living beings is *Naramedh*. The work of the Lord is creation and stability based, the work of the living be-

ings is destruction based. The act of Yajna is performed by combining these two. The evolution or conclusion of the world of living beings, the pretence of forgetting His own Self, the act of self-sacrifice, the game or inter-play of hide and seek, these are ways of savouring His own self by Himself, to help His beloved beings savour Him – the solving of the mystery that is the Lord by the living beings after purifying and tranquilising their selves and perceiving Divinity everywhere – participate in His game of life – this is the mystery of creation, stabilization and destruction – this is the theory of Yajna. The saying "*Sahayajnaah prajaah srishtwaa*" seems very appropriaite. The action of the wind of the Yajna, life's shaking and trembling as the play of fire and moon may be seen elsewhere in the Vedas. Yajna is the conservation of energy and persistence of Force, Yajna is the stretching and contraction of the power of the discontent, Yajna is the dance of the gods, Yajna is the theory of resonance. Yet again, Yajna is arrival of the divine force of action's arrival from the potential state to the Kinetic state. And then again revert to the potential state. Yajna is the repetition of the wheel of action (*Karmachakra*), religion (*Dharmachakra*) and the world (*Jagatchakra*).

(Translated by Indrani Bose)

In the science of Yoga, Susumna is termed as the Ganges as it flows from *Mulaadhaar* to *Sahasraar.* According to the sages the water of the river Ganges is most pure and so importantly and metaphorically she represents the knowledge of the Absolute, the spirit of God. Bathing in the waters of the Ganges on a physical level, means sanctifying the body with pure water, and in the metaphysical sense, it means to embellish the minds with pure thoughts, to realise the presence of God by indulging the soul in the knowledge of the Absolute Truth.

–Srimat Premananda Tirthaswami

শ্রীকৃষ্ণসংঘ প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বাংলা

১। সংক্ষিপ্ত পূজাতত্ত্ব	৪০.০০	১৭। দেবতাতত্ত্ব সমগ্র	১৫০.০০
২। পূজামন্ত্র (অর্থ ও অন্বয় সহ)	২০.০০	১৮। জন্মমৃত্যু ও পুনর্জন্ম	৩০.০০
৩। পূজামন্ত্র	১০.০০	১৯। নৈমিত্তিক পূজা	৫০.০০
৪। যজ্ঞ-তত্ত্ব	৯০.০০	২০। ছবি ও বাণী (এ্যালবাম)	১০০.০০
৫। যজ্ঞ-মন্ত্র (অর্থ ও অন্বয় সহ)	২০.০০	২১। মর্ম্মকথা এবং হওয়া ও পাওয়া	৯০.০০
৬। যজ্ঞ-মন্ত্র	৫.০০	২২। সংস্কারবিধি — ১ম খণ্ড	১২০.০০
৭। ভালবাসা ও সেবা	১০.০০	২৩। সংস্কারবিধি — ২য় খণ্ড	৯০.০০
৮। সামঞ্জস্য	১০.০০	২৪। বেদ জানতে হলে	১২০.০০
৯। লীলা ও পুরুষোত্তম	১০.০০	২৫। শ্রদ্ধাঞ্জলি (চাকমায়ের জীবনী)	১০.০০
১০। দেখা	২০.০০	২৬। শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ	২৫.০০
১১। শোধন ও আত্মনিবেদন	১০.০০	২৭। প্রেম-আনন্দ-কথা —(১ম ,২য়,৩য়,৪র্থ)	৫.০০
১২। ঠাকুরের জীবনী — (১ম ও ২য়)	২০.০০	২৮। প্রেম-আনন্দ-কথা — (৫ম ও ৬ষ্ঠ)	১০.০০
১৩। ঠাকুরের জীবনী — (৩য় ও ৪র্থ)	৩০.০০	২৯। সদা-আনন্দ-কথা (১ম, ২য়, ৩য়)	১০.০০
১৪। সাধনা ও মুক্তি — (১ম ও ২য়)	১০.০০	৩০। সদা-আনন্দ-কথা — ৪র্থ খণ্ড	২০.০০
১৫। পুরানো সংঘবার্তা	১০.০০	৩১। ছুটির দিনে মেঘের গল্প	৫০.০০
১৬। পুরানো মুখপত্র	৫.০০	৩২। গৌতম বুদ্ধ ও বাণী	৩০.০০

हिन्दी

१। पुजा-मन्त्र	२०.००	५। स्वामीजी की जीवणी एवं पत्रावली	२५.००
२। पूजा-तत्त	२५.००	६। — ऐ — २य खन्ड	१०.००
३। यज्ञ-मन्त्र	१०.००	७। भगवत साधना	१०.००
४। तत्त कथा	८.००	८। सदा-आनन्द-कथा	१५.००

English

1. Puja-Mantra	200.00	5. Lord as I saw Him	90.00
2. Abridged Puja	40.00	6. Life of an Indian Saint	30.00
3. Puja-Tattva	450.00	7. Life Sketch & Letters	30.00
4. Yajna-Mantra	200.00	8. Yajna-Tattva	225.00

"Sanyashi Dada" DVD with English sub-title Rs. 400.00
"Puja-Mantra" by Pt. Ajay Chakraborty Rs. 150.00

প্রতিটি ক্যাসেট ৪০টাকা এবং সিডি ৭৫টাকা

১) সকালের পূজা
২) সন্ধ্যার পূজা
৩) পূজার গান
৪) শর্মিলা বসুর কীর্তন
৫) ১লা বৈশাখের গান
৬) রাসপূর্ণিমার গান
৭) চন্দনা চক্রবর্তীর গান
৮) অজয় চক্রবর্তীর গুরুবন্দনা ও দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়ের গান
৯) সর্বানী গুপ্তুর গানের ডালি

Srikrishna Sangha (Registered under W.B. Societies Act. 1961) A Religious Society
Vol. 45 No.4 Srikrishna Sangha Barta November 2011 Kartik 1418

প্রেমানন্দ কথা

- কাজ করিয়া যাও— ভিতর হইতে আনন্দ বাহির হইবে। গলদ তিনি দুর করিবেন। তার প্রেম স্বরণ করিলে আর কি ভুল করা যায়?

- বিছানায় বসিয়া সব কাজে তার মনের মতন করিয়া চালাইবার জন্য একটু প্রার্থনা। রাত্রে সব অন্যায়ের জন্য পবিত্র করিয়া কাছে টানিয়া নিবার জন্য প্রার্থনা ভাল। সব কাজকে পূজায় পরিণত করার চেষ্টা দরকার নির্মম নিরহংকার হওয়া চাই। ভিতরে বসে কে সব করছে তাহা অনুভব করিতে চেষ্টা করিও। প্রেমানন্দকে পেয়েই বসেছ - অনুভব করিতে চেষ্টা করিও। নিজগুনে তাহার মনের মতন করিয়া লইবেন। সেটা যে তাহার কাজ।

- আরও শিশু হইতে চেষ্টা কর। নিজগুণে সব ঠিক করিয়া লইবেন। তোমার শুভ সময় শীঘ্রই আসিবে ব্যস্ত হইও না।

Composed by DTP & Printed by Anandadham Printing Press
Publisher : Bijaya Dutta, Vice-President, Srikrishna Sangha
Editor : Barun Kumar Chattopadhyay Price : Rs. 20/- only